আলোচনা-সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত

প্রথম প্রচারণ

সন ১৩২০, আশ্বিন।

মূল্য ১।০ দেড় টাকা [illegible]

Published by

SEAL
Printed by S. K. SEAL.
233 Upper Chitpur Road, Cal

উৎসর্গপত্র

কলিকাতা পোস্তা রাজবাটীর স্বধর্ম্মনিরতা রাজকুললক্ষ্মী রাজ্ঞী

শ্রীমতী সখীসোণা দাসী মহোদয়া

স্বধর্ম্মাশ্রিতাসু—

জননি!

আপনার পূজনীয় পতিদেবতা এ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে পিতার তুল্য মান্য ও শ্রদ্ধাভক্তি করেন দেখিয়া আপনিও না কি তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন; আমার প্রতি আপনারও না কি শ্রদ্ধা-ভক্তি সমধিক। ভক্তিমতী রমণীর পবিত্র-হৃদয়-নিহীত ভক্তিভাবের প্রতিদান মরজগতে দুর্লভ—নাই বলিলেও বলা যায়, তবে দরিদ্র ব্রাহ্মণের হৃদয় আছে—ইহাতেও সময়ে-সময়ে একএকটী ধর্ম্মকুসুম প্রস্ফুটিত হয়, এক্ষণে যাহা ফুটিয়াছিল, আজ সেই কুসুমহার "মায়ার খেলা" রূপে গ্রথিত করতঃ স্নেহনীর মাখাইয়া আপনাকে অর্পণ করিলাম। মা! নিজ হৃদয়বাৎসল্য-স্নেহে ইহা গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর। কিমধিকমিতি—

দক্ষিণ বাঁটরা—
৩৮ নং পঞ্চাননতলা রোড,
হাওড়া।
৩০ শে ভাদ্র, ১৩২৫ সাল।

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

মায়ার খেলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বের কথা

হৃদয়বান ব্যক্তিরই মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠে। যাহার হৃদয় অপ্রশস্ত, প্রাণ ছোট, মন বলহীন, তাহাতে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বে আমাদের ঐরূপ মনের, প্রাণের এবং হৃদয়ের তেজ ছিল বলিয়াই আমাদের দেশে রাম-লক্ষণের ন্যায় পিতৃভক্ত, অর্জ্জুনের ন্যায় যোদ্ধা, ত্যাগী এবং যুধিষ্ঠিরের মত ধার্ম্মিক লোক জন্মগ্রহণ করিয়া দেশ পবিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভিতর যেমন বড় ছিল, বাহিরেও তাঁহারা সেইরূপ দীর্ঘায়তন ছিলেন। আয়ুর সংখ্যাও সেইরূপ শত-সহস্র বৎসর ধরিয়া গণনা করিলেও ফুরাইত না। এখন ভিতর ছোট হইয়াছে বলিয়া, মন-প্রাণের তেজ কমিয়াছে বলিয়া, আমরা এত ছোট হইয়াছি, আমাদের এত অধঃপতন হইয়াছে। তখন প্রাণের তেজ ছিল বলিয়া, আমরা সুদীর্ঘ দেহ ধারণ করিয়া কত অসাধ্য সাধন করিতাম, আর এখন সেই আমরা সার্দ্ধ-ত্রিহস্তপরিমিত দেহ ধারণ করিয়া, একটা সামান্য ভার বহন করিতেও অক্ষম; তখন আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে কর্ত্তা সাজিয়া কত আত্মীয়-স্বজনের

ভরণ-পোষণ করিতাম, কত অনাথ-অতুরকে অন্ন জল না দিয়া পানাহার করিতাম না, দুই-দশবিঘা জমির মধ্যে সুপ্রশস্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ না করিয়া, কালাতিপাত করিতে যেন আমাদের লজ্জা বোধ হইত, আর এখন আমরা নিজের পুত্র-কলত্রমাত্র লইয়া ছোট একখানি অপ্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বহুকষ্টে দিন কাটাইতেছি। আরাধ্য জনক-জননীর ভার লইতেও যেন এখন আমাদের কষ্ট বোধ হয়; তাই পুত্র আজ পিতা-মাতার সহিত পৃথকান্ন, ভ্রাতায়-ভ্রাতায় সদ্ভাব নাই; একজন লোক অতিথি হইলে আমরা আকাশ-পাতাল ভাবিয়া আকুল হই। প্রাণের তেজ কমিয়াছে বলিয়া, হৃদয়কে খুব ছোট করিয়াছি বলিয়া কি আমাদের এই সকল অধঃপতন হয় নাই?

সে আজ বেশী দিনের কথা নহে। যখন ইংরাজরাজত্বের পূর্ণ প্রভাব এ দেশে প্রকটিত হয় নাই; যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার মোহকর ভাব দেশবাসীর শিরায়-শিরায় সংবদ্ধ হয় নাই; আজ প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে দেবীপুর গ্রামের রতন ঠাকুরের কথা মনে পড়ে। রতন ঠাকুরের প্রকৃত নাম রামরতন চট্টোপাধ্যায়; স্বকৃত ভঙ্গ, কুলে, মেল, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান; ব্রাহ্মণ অশেষ কীর্ত্তিমান এবং প্রশস্ত হৃদয়বান ছিলেন বলিয়া, তখনকার লোকে তাঁহাকে রতন ঠাকুর বলিয়া অভিহিত করিত। রতন ঠাকুর বাস্তবিকই রত্ন হতেও সমুজ্জল; একান্নবর্ত্তী সুবৃহৎ পরিবার পরিচালনই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি; তাঁহার কোন গুণের তুলনা ছিল না; ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য; দৈহিক সৌন্দর্য্যে কামদেব বলিলেও অত্যুক্তি হইত না;

সেই সৌন্দর্য্যময় সুদীর্ঘ মহাপুরুষকে দেখিলে, তাঁহার অমিয়-মধুর শ্রবণ-সুখকর বচনাবলী শুনিলে তাঁহাকে দেবতা ভিন্ন আর কিছু বলা যাইত না। **রতন ঠাকুরের** ছোট একখানি জমিদারী ছিল, ব্রাহ্মণ সঞ্চয় করিতে জানিতেন না বা ব্রাহ্মণের পক্ষে উহা ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য বলিয়া, তিনি সুবৃহৎ সংসার পাতিয়া সকলের ভরণ-পোষণে, সুখ-স্বচ্ছন্দে ব্যয় করিয়া মনের আনন্দে দিন কাটাইতেন। **রতন ঠাকুরের** আপনার বলিতে পত্নী **দুর্গাবতী** ও দুইপুত্র,—জ্যেষ্ঠ **পান্নালাল**, কনিষ্ঠ **চুণীলাল** কিন্তু প্রতিদিন তাঁহার বাটীতে দুইবেলা একশত পাত পড়িত, প্রতিদিন এতগুলি লোকের ভরণ-পোষণ যোগাইয়া, তিনি দিন-যামিনী বাসগৃহ মুখরিত রাখিতেন। এই সুবৃহৎ সংসারের প্রতি তিনি একদিনের জন্যও বিরক্ত হইতেন না। **রতন ঠাকুরের** সৌভাগ্য দেখিয়া, যে কোন আত্মীয় তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিত, উদর পুরিয়া দুইবেলা আহার করিত, **রতন ঠাকুর** মুখ ফুটিয়া কাহাকেও যাইতে বলিতে পারিতেন না। পত্নী **দুর্গাবতী**ও দুইচারিজন পরিচারিকাসহ প্রতিদিন ইহাদের সেবা করিতেন; অন্নপূর্ণার ন্যায় পরিতোষসহকারে সকলকে ভোজন করাইতেন, একদিনের জন্যও এ সকল কার্য্যে তাঁহার আলস্যভাব পরিলক্ষিত হইত না। হৃদয়ে তেজ থাকিলে, ধর্ম্মকর্ম্মে রতিমতি রক্ষিত হইলে; দৈহিক ক্ষমতা যে পরিবর্দ্ধিত হয়, এখনকার মা লক্ষ্মীগণ হয় ত তাহা বিশ্বাসই করিবেন না, **দুর্গাবতীর** এ পরিশ্রমের কথা শুনিয়া হয় ত তাঁহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু তখনকার দিনে ও

দুর্গাবতী কেন, বাঙ্গালীর আনন্দময় সংসারে এরূপ আনন্দময়ীর সংখ্যা কম ছিল না। কম ছিল না বলিয়াই বাঙ্গালীর খ্যাতি, প্রতিপত্তি সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

রতন ঠাকুরের বয়স অনেক হইয়াছিল; শতের সীমান্তে উপনীত হইলেও তিনি তখনও কোনকাজে অপটু ছিলেন না। হিন্দুর আচার-ব্যবহার প্রতিপালন করিয়া চলিতেন বলিয়া, তত-বয়সেও বেশ পরিশ্রম করিতে পারিতেন, যাহা করিতে এখনকার যুবা পুরুষেরাও হারি মানিয়া যায়। প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া নামাবলী স্কন্ধে মনোমত পুষ্পচয়নের জন্য চারি-পাঁচ ক্রোশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেন। তারপর প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া হাট-বাজার করিবার জন্য বাহির হইতেন। এ কার্য্য তাঁহার স্বতন্ত্র প্রকারের ছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত মহামায়া দেবী ও দেবতা ভৈরবের মন্দিরে যাইয়া প্রতিদিন বাজারের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইত। রতন ঠাকুর প্রত্যেক কার্য্য এই দেব-দেবীর মত না লইয়া করিতেন না। যে কোনকার্য্যই হউক, একবার তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতেই হইত। পুত্র যেমন বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোনকাজ করে না, রতন ঠাকুরও তেমনি এই আরাধ্য গৃহ-দেবতাদিগকে না জানাইয়া কোনকাজ করিতেন না। বাজারে যাইবার পূর্ব্বে কি-কি দ্রব্যাদি কিনিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। স্বরূপ সরকার কাগজ-কলম লইয়া বাহিরে থাকিত।

রতন ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঠিক বালকের মত

ডাকিয়া বলিতেন,—“কিগো মা! কাল ঝালের ঝোল্‌টা ভাল হয় নাই; আজ নূতন পটল উঠেছে, তারই ঝোল হউক, হ্যাঁ বাবা! তোমার জন্য কি পাকা বেল আনিব?” এরূপ তন্ন-তন্ন করিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি কিনিবার ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া লইতেন। যেটী তাঁহার খাইতে ভাল লাগে, সকলের অগ্রে সেইটীও সংগ্রহ করিতেন। এইরূপ না করিলে আত্মমত সেবা হয় কি? দেবতা যেন তাহাতে আপনার সম্মতি প্রদান করিতেন। মহামায়ার দশহাত, লাল শাটী পরা মাতৃমূর্ত্তি, সেই প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তির এত ঔজ্জ্বল্য যে দেখিলেই জীবন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইত। মূর্ত্তি যেন কথা কহিতে আসিতেছে, সাধকপ্রবর **রতন ঠাকুরের** প্রাণ-প্রতিষ্ঠার গুণে যে প্রতিমায় এরূপ প্রাণসঞ্চার হইয়াছিল, মূর্ত্তি যে এমন প্রাণময়ী হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। **রতন ঠাকুর** পিতা-মাতার ন্যায় তাঁহাদের নিকট আবদার করিতেন, শুনা যায়—তিনি আবদার করিয়া যখন যাহা চাহিতেন, তাহা কখন নিষ্ফল হয় নাই; দেবীর কৃপায় সমস্তই লাভ হইত; অনেক অসাধ্য-কার্য্য সুসাধ্য হইয়া যাইত, লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিত,—“ঠাকুর! যাহা মানুষে করিতে পারে না, তাহা তুমি কেমন করিয়া করিলে?”

রতন ঠাকুর বলিতেন,—“মহামায়ার খেলার কথা কি কিছু বলিতে পারা যায়? এ জগতে তিনি কাহাকে দিয়া কোন্ কাজ সাধন করিয়া লয়েন, তাহা কে বলিতে পারে? অসাধ্যও সুসাধ্য হয়, তবে যাহারা বুঝে না, তাহারা বলে, “আমি করিলাম” কিন্তু আমি কে, মহামায়ার কৃপা না হইলে একটী তৃণ তুলিবার ক্ষমতা কি

আমার নিজস্ব? **রতন ঠাকুর** যে একবার ধম্‌কাইয়া একদল ডাকাইতকে বশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেও কি তাঁহার ক্ষমতা? সে সমস্তই "**মায়ার খেলা**।"

ফর্দ্দাদি প্রস্তুত হইলে তিনি দন্তধাবনের দ্রব্যাদি রাখিয়া দ্বার বন্ধ করতঃ বাজারে যাইতেন। **স্বরূপ সরকার** ও একজন চাকর সঙ্গে যাইত। **স্বরূপ ঘোষ** আজ তিন পুরুষ হইল, এই জমিদার বাটীতে দাসত্ব করিতেছে। তাহার পিতা, পিতামহ মান্যের সহিত চাকুরী করিয়া গত হইলে **রতন ঠাকুরের** আমলে **স্বরূপ** সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। কর্ত্তা মহাশয় **স্বরূপকে** ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করিতেন; কোথাও যাইতে হইলে তাহাকে না লইয়া যাইতেন না। এখন হইলে বোধ হয় কোন সংসারে তাহার স্থান হইত না, সে এত অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল যে, এখনকার সময়ে কেহ তাহাকে আদর করিত না কিন্তু চট্টোপাধ্যায়ের সংসারে তাহা নহে। **স্বরূপ** যত বৃদ্ধ হইতে লাগিল, এ সংসারে সম্ভ্রমও তাহার তত বাড়িতে লাগিল। সকলেই কর্ত্তার প্রতিনিধি মনে করিয়া তাহার কোন কথা ঠেলিতে পারিত না, এমন কি গৃহিণীও তাহার কথা মানিয়া চলিতেন। তাহার কতকগুলি মুদ্রাদোষ ছিল; তাহার উপর কথা কহিতেও সময়ে সময়ে এত আট্‌কাইয়া যাইত যে, বদন রক্তবর্ণ না হইলে একটী কথাও বাহির হইত না। "ওর নাম কি, বুঝেছ" ইত্যাদি স কথা কহিতে-কহিতে বহুবার প্রয়োগ না করিলে থাকিতে পারিত না।

বাজারে যাইয়া **স্বরূপ** বলিল,—"দা দা দাদাঠাকুর! ওর নাম

কি? কাল গিন্নীমা নিম্‌পাতা লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। বাগানে নিম্‌পাতা আদৌ পাওয়া যায় নাই। জি জি জিতুর খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে।

রতন ঠাকুর! জিতু কে হে স্বরূপ? সে কার ছেলে, তুমি জান কি?

স্বরূপ। সে সে সেই যে "ওর নাম কি" সে আপনার মা মা মাসতুতো ভাইয়ের সম্বন্ধীর ছোট ছেলে বুঝেছেন?

রতন। হাঁ হাঁ! তা মনে করে দুইপয়সার নিও, তার আর কি?

স্বরূপ। দা দা দাদাঠাকুর! ওর নাম কি, এ এ সময় প প পটল বেশ খেতে ভাল লাগে—বুঝেছেন?

রতন। আচ্ছা, আচ্ছা ভাল, তা নিও। ওর জন্য আর জিজ্ঞাসা করা কেন।

বাড়ীতে কোন কাজকর্ম্ম হইলে, লোকে যেরূপ হাট-বাজার করে, রতন ঠাকুর প্রত্যহ সেইরূপ করিতেন। ঠাকুরের সাংসারিক খরচ দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া যাইত। তাঁহার সংসারে এত লোক যে, তিনি দুই-চারিজন ভিন্ন সকলকে চিনিতেন না, কোন কাজকর্ম্মের জন্য তাঁহার নিকট আসিতে হইলে পরিচয় দিয়া দাঁড়াইলে তবে চিনিতে পারিতেন। একান্নবর্ত্তী পরিবার যে কিরূপ মহৎ, তাহা দেবীপুরের চাটুয্যেবংশই দেখাইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য যে কত কষ্টসহিষ্ণু হইতে হয়, কত ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা কেবল রতন ঠাকুরের বংশেই বেশ জানা ছিল। তাই সকলে উপমা দিয়া বলিত, "এ কি রতনের সংসার যে, যে

আসিবে, সেই থাকিতে পাইবে? এ যে মাগভাতারের সংসার।" কর্তার মত গৃহিণী দুর্গাবতী কিন্তু কাহার নিক[illegible] [illegible] ছিলেন না; তিনি সকলকেই চিনিতেন। জ্যে[illegible] সহিত যখন তিনি সকলকে আহারীয় পরিবেশন করিতেন, সকলকে উদর পুরিয়া খাওয়াইতেন, তখন সকলেই তাঁহার নজরে পড়িত; সকলকেই তিনি আপনার পোষ্য নির্ব্বিশেষে আদর করিয়া খাওয়াইতেন। ক্ষুধার সময় তিনি যেমন আহার যোগাইতেন, রোগের সময় সেবা বিষয়েও তিনি কোনপ্রকার ত্রুটী করিতেন না। দিনরাত্রির মধ্যে মাত্র দুইঘণ্টা বিশ্রাম করিতেন; তার পর শিবানীকে লইয়া তিনি অধীনস্থ জনগণের সেবায় কালাতিপাত করিতেন। বধূটীও ঠিক শাশুড়ীর অনুকরণ করিয়াছিলেন, একদিনের জন্যও ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন না; দুর্গাবতীর সহিত অবস্থান করিয়া, তাঁহার সেবাধর্ম্মের ভাব অনুভব করিয়া তিনিও শিক্ষার পূর্ণফলাভ করিয়াছিলেন, প্রথম দুই-একদিনের পর এ কাজে আর তাঁহার কোন বাধা-বিঘ্ন বোধ হইত না, অকুণ্ঠিতচিত্তে অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া বালিকা ক্লান্তি বোধ করিত না, দ্বিগুণ উৎসাহে শাশুড়ীর সহিত তিনি এই বিশাল সংসার পরিচালনা করিতেন। যেমন শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া যায়, ছেলেবেলা হইতে যে ভাবে চরিত্র-গঠন হয়, মানুষ তাহাই লইয়া আজীবন সুখে কাটাইয়া থাকে। বাল্যের শিক্ষায় দোষ-গুণের সহিত জীবনের সমস্ত দোষ-গুণ নির্ভর করে। হিন্দু-স্ত্রীর হিন্দুর মত বাল্যশিক্ষা উঠিয়া গিয়াছে বলিয়াই আজ আমাদের সংসারে এত হাহাকার!

আজকাল স্ত্রীপুরুষ আর দুই-তিনটী অপগণ্ড লইয়াই বঙ্গ-সংসার আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে; তবে যদি একান্ত বদান্যবর কেহ থাকেন, তাহা হইলে কাহার সংসারে বিধবা পিসী বা ভগ্নীকে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন আপনার অন্তরঙ্গ লোককে প্রতিপালন করিয়াই কেবল লোকে সংসারের দায়ীত্ব পরিসমাপ্তি করিত না, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ীকে গৃহে বাস না করাইলে তাঁহারা যেন কুল উজ্জ্বল বলিয়া মনে করিতেন না। এখনকার মত এক ঢোল, এক কাঁসী লইয়া আসর জাঁকাইতে তখন কেহ ইচ্ছা করিত না। এরূপ সংসারে আস্থাবান হওয়া অপেক্ষা অরণ্যে বাস তখনকার লোকে ভাল মনে করিত। এখনকার লোক যত সংকীর্ণমনা হইতেছে, আত্মীয়স্বজনকে তত ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিতেছে; ভিতরের ধর্ম্মভাব ছাড়িয়া দিয়া ততই বাহ্য চাকচিক্যে মজিতেছে। তাই এখন স্ত্রীর সম্বন্ধীয় কেহ গৃহে আসিলে পিতা-মাতা অপেক্ষাও তাহার মান বেশী, প্রভাব, প্রতিপত্তি বেশী, খাতিরও বড় কম নয়। আজকাল বাহিরের ভাব লইয়াই সকলে বিভোর। আদর, ভালবাসা, শোভন—পারিপাট্য যত বাহিরে দেখাইতে পারিবে, ততই তোমার মন মুগ্ধ হইবে; পিতা-মাতার অন্তরের ভালবাসা, সেই প্রাণ দিয়া প্রাণের ভালবাসা, এখন আমাদের কাছে বিরক্তিকর; তাহার স্থানে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেই স্বার্থপূর্ণ বাহিরের ভালবাসা এখন আমাদের সুখের উৎস খুলিয়া দেয়, তাহাতে মনপ্রাণ মজিয়া যায়। সহোদর-সহোদরার সেই সম্মানসূচক প্রাণের ভালবাসা অপেক্ষা শ্যালক-শ্যালিকার হাবভাবপূর্ণ হাস্য-পরিহাসযুক্ত মৌখিক ভালবাসা এখন হৃদয়মুগ্ধকর—

সোহাগের আকর। আসলের আদর গিয়াছে, এখন নকলের রাজত্ব বিস্তৃত। তাই এখন যাহা দেখি তাহাই যেন কেমন একরূপ বিষদৃশ ভাবে নয়নের বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায়।

রতন ঠাকুরের মত সেই সোণার সংসার, সেই ধর্ম্মভাবপূর্ণ পবিত্র আবাসগৃহ, সেই সুবিশাল একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রতিপালন-প্রথা আজকাল সারা বাঙ্গালা দেশটা খুঁজিলেও মিলিবে না। যে ভাবের অভাব হইয়াছে, হায়! শতচেষ্টা করিলেও তাহা আর পাওয়া যাইবে না। প্রতিমা গিয়াছে, কাটাম পড়িয়া আছে, কায়া গিয়াছে, এখন অবছায়ার মত সেই পবিত্র স্মৃতিটুকু ধুক-ধুক করিতেছে। নিষ্ঠুর কাল সবই গ্রাস করিয়াছে; সমস্তই উদরস্থ করিয়া আপনার মহিমা প্রচার করিবার জন্য রাখিয়াছে মাত্র ক্ষীণ স্মৃতিটুকু; যাহা হা-হুতাশে রক্ষিত হইয়া আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে বৃশ্চিকের অসহ্য দংশনযাতনা প্রদান করতঃ মর্ম্মস্থল দগ্ধ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরিবর্ত্তনে পতন

একজাতীয় বীজোৎপন্ন সকল বৃক্ষই যেমন সমান ফল প্রসূত হয় না; এক পিতা-মাতার সকল সন্তানই সেইরূপ সমান প্রকৃতিসম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। সকল পুত্রই পিতা-মাতার গুণের অনুকরণ করে না; জন্ম বা তিথিনক্ষত্রদোষেও সময়ে-সময়ে ভিন্ন স্বভাব প্রাপ্ত হয়। রতন

ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র পান্নালাল পিতার অনুরূপ গুণসম্পন্নই হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ চুণীলাল কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন, পরম ধার্ম্মিকের ঔরসজাত এবং পরম গুণবতী দুর্গাবতীর গর্ভজাত হইয়াও সে এমন দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন হইয়াছিল যে তাহাকে রতনু ঠাকুরের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে আমাদের যেন লজ্জা বোধ হইতেছে। এমন দুষ্কর্ম্ম নাই, যাহা তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত না; তবে পিতা-মাতা ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য বলিয়া সকলে তাহাকে মান্য করিয়া চলিত, দোষ হইলেও একটা পবিত্র বংশের কলঙ্ক রাষ্ট্র হইবে ভাবিয়া তাহা ঢাকিয়া লইত; ইহাতে দুশ্চরিত্র চুণীলাল আরও প্রশ্রয় পাইতে লাগিল; তাঁহার হৃদয় অত্যধিক সাহসে উৎফুল্ল হইতে লাগিল।

জ্যেষ্ঠপুত্র পান্নালাল ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হন নাই; দেবভাষা সংস্কৃতেই তাঁহার জ্ঞানলাভ হইয়াছিল; কাজেই চরিত্র সাত্ত্বিকভাবেই গঠিত হইয়াছিল। পিতার ন্যায় সদ্‌গুণ-মণ্ডিত হইয়াই তিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূজা-আহ্নিক, তপ-জপ, পরোপকার তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। আর চুণীলাল ইংরাজী শিক্ষিত হইয়া ভিন্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন ইংরাজী ভাষা দেশে এত অধিক পরিমাণে অস্থিমজ্জাগত হয় নাই, কেহ বড় শিখিতে ইচ্ছা করিত না। কিছুদিন পরে যখন রাজভাষা বলিয়া লোকে তাহার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিল, যখন সে ভাষা শিক্ষায় সকলের আগ্রহ জন্মিল, তখন দেশের ভাব, দেশবাসীর জীবনের স্রোত ভিন্ন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হিন্দুয়ানী কতক পরিমাণে যেন হ্রাস হইতে

লাগিল; বিদেশীয় ভাব যেন অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালীকে একপ্রকার বিকৃত করিয়া ফেলিল। ইংরাজী শিক্ষার মধ্যযুগে বাস্তবিক দেশের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল। যখন ইংরাজীর যথার্থ ভাব লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই; ইহাতে আমাদের যে কি উপকার, যখন লোকে ভাল বুঝিতে পারে নাই, সেই নূতন অবস্থায় ইংবাজী শিক্ষিত হইয়া সকলেই একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। তখন যথার্থ শিক্ষা হইত না, কেবল হাবভাবে মজিয়া লোকে "ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট" হইয়া যাইত। নূতন একটা জিনিষ পাইলে লোকে যেমন তাহার দোষ-গুণের বিচার করে না, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, এ চিন্তা করিবার যেমন সময় থাকে না—নূতনের মোহে মুগ্ধ হইয়া তাহারই স্রোতে ভাসিতে থাকে, প্রথম ইংরাজী শিক্ষার সময়ে লোকের প্রাণের ভাব এইরূপই হইয়াছিল। কতটুকু আমাদের প্রকৃতির অনুরূপ, কতটুকু আমরা সহ্য করিতে পারিব, তাহা না ভাবিয়া সকল বিষয়ের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমাদের অনেকেই হিন্দুত্ব বর্জ্জিত হইয়া গিয়াছিল। চুণীলালও ইহার মোহ এড়াইতে পারে নাই। পূর্ব্বপুরুষের আচরিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম একপ্রকার কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিল; যথেচ্ছাচার প্রবল হইয়া উঠিল, পিতা-মাতা বড়ই চিন্তিত হইলেন; সবেমাত্র দুই পুত্র, তাহার একটী যদি ধর্ম্মহীন হয়, তাহা হইলে ত বংশ কলঙ্কিত হইয়া যাইবে, পিতৃ-পুরুষের নাম ডুবিবে? রতন ঠাকুর কয়েকজন বন্ধুর প্ররোচনায় পুত্রকে ভিন্ন ভাষায় পণ্ডিত করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ভাষা শিখিতে দোষ নাই ভাবিয়া, তিনি পুত্রকে নব-প্রচারিত রাজভাষায় বুৎপন্ন

করিতে কোনপ্রকার দ্বিধা বোধ করেন নাই; পুত্র কিন্তু শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া তুলিল; ভাষা শিখিতে যাইয়া স্বভাবের বিপর্য্যয় করিয়া ফেলিল। ইংরাজী শিক্ষার গুণ কিছুই গ্রহণ করিতে পারিল না। যাহা আমাদের ধর্ম্মের ও স্বভাবের পক্ষে অনিষ্টকর, যাহা অনুকরণ করিলে এ দেশীয় লোকসমাজে ঘৃণীত হইয়া পড়ে, চুনীলাল তাহাতেই অভ্যস্থ হইল। সে আচার-ব্যবহার কিছুই মানিত না; দেব-দ্বিজে ভক্তি করা কুসংস্কার বলিয়া তাহার ধারণা হইয়া গেল। সন্ধ্যা-আহ্নিকে আর সে সময়ক্ষেপ করে না, বৃথা আমোদ-প্রমোদ, বিভৎস ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া গ্রামে ঘোর অশান্তির অনল জ্বালিয়া দিল।

পূর্ব্বে একজন মিশনারী চুনীলালকে শিক্ষা প্রদান করিত; রতন ঠাকুর পুত্রকে তাহার অধীনে আর না রাখিয়া দেশের কোন ভাল শিক্ষকের নিকট পাঠের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন দেশের পল্লীতে-পল্লীতে খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রচার জন্য মিশনারী ঘুরিয়া বেড়াইত। পাড়ার লোকের সহিত সখ্যতা করিয়া, তাহারা বালক-বালিকার মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিত। আমরা যে নানাপ্রকার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পরকাল নষ্ট করিতেছি, হিন্দুধর্ম্মের অশেষবিধ নিন্দার সহিত ইহা তাহারা সকলকে বুঝাইয়া দিত। নূতনের মোহে মুগ্ধ হইয়া, নূতন ভাবে বিভোর হইয়া সকলে তাহাই শুনিত; এইরূপে ক্রমে-ক্রমে দেশে নূতন ধর্ম্মের স্রোত প্রবল হইল; সকলে নূতন তন্ত্রের শিক্ষায় বালক-বালিকা-গণকে শিক্ষিত করিতে তৎপর হইল। এই পরিবর্ত্তনের সময়ে অনেকেই মিশনারীদের গোঁড়া হইয়া ছেলে ধরিতেও আরম্ভ করিল।

রতন ঠাকুর সরল অন্তঃকরণের লোক ছিলেন। যখন বন্ধুগণ আসিয়া বলিল,—"পুত্রকে নূতন ভাষা শিক্ষা দাও।" রতন ঠাকুর মনে করিলেন, সংস্কৃত আমাদের দেবভাষা, জ্যেষ্ঠপুত্র ও আমি ইহাতে বেশ শিক্ষিত হইয়াছি; বৃদ্ধ বয়সের কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রথমে রাজভাষা শিক্ষা দেওয়া মন্দ নহে। যখন ইংরাজের অধীনে আমাদিগকে বাস করিতে হইবে, তখন তাঁহাদের ভাষায় আমাদের অভ্যস্ত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। চুণীর সংস্কৃত শিক্ষা চেষ্টা করিলেই আমাদের দ্বারা হইবে কিন্তু ইংরাজী ত হইবে না? যখন এরূপ একটা সুযোগ হইতেছে, তখন তাহা ত্যাগ করা উচিত কি? পুত্রের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য কোন্ পিতা-মাতা চেষ্টা না করেন. কিন্তু নির্দ্দয়হৃদয় অদৃষ্টদেব যে এইসময় হইতে তাঁহার পবিত্র বংশ-মণ্ডপে পাপনাটকের অভিনয় করাইয়া দিবেন; মহামায়ার লীলাখেলা যে চুণীলাল হইতে এ বংশে নূতনভাবে প্রদর্শিত হইবে, তাহা রতন ঠাকুরের বোধগম্য হয় নাই। সামান্য অপবিত্রতার অছিলা করিয়া মহারাজা নলের দেহ যেমন কলির অধিকৃত হইয়াছিল।. শিক্ষার দোহাই দিয়া চুণীলালকে আশ্রয় করিয়া তেমনি পুণ্যপূত এই ব্রাহ্মণবংশে ঘোর অনাচার প্রবিষ্ট হইয়া বংশ কলঙ্কিত করিতে লাগিল।

বংশধরগণের উপরই বংশের উন্নতি, অবনতি নির্ভর করে। তুমি যতই নির্ধন হও না কেন, যতই কষ্টে তোমার দিনপাত হউক না কেন, যখন দেখিবে—তোমার বংশে সুসন্তান জন্মিয়াছে; স্বধর্ম্মনিরত জ্ঞানবান পুত্র-কলত্রে তোমার গৃহ পূর্ণ হইতেছে; তখনই বুঝিবে তোমার দারিদ্র্য-ঘন অপসারিত হইয়াছে; তোমার বংশে

সৌভাগ্য-সুবৃষ্টি বর্ষণের আর বেশী বিলম্ব নাই; অচিরেই তোমার দুর্ব্বিসহ দুর্দ্দশা দূর হইবে; তুমি সুখ-স্বাচ্ছন্দের পুণ্যপূত সুনির্ম্মল-সরোবরে অবগাহন করিয়া অচিরেই দেহ, মন জুড়াইতে পারিবে। আর যখন দেখিবে—অতুল বিত্ত-বিভবে ধনাগার পরিপূর্ণ, আপাত মধুর সুখ-স্রোতে তুমি অবগাহন করিয়া রহিয়াছ; অথচ তোমার পুত্র কন্যাগণ দুর্বিনীত, পাপে, অনাচারে, কুশিক্ষায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, অমনই বুঝিবে, তোমার অদৃষ্টগগন দুঃখ-রাহুর করালগ্রাসে গ্রাসিত হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই, অচিরেই সুখের স্রোতে ভাটা পড়িবে। দারুণ-প্রলয়-পবন আন্দোলিত হইয়া তোমার সাজান বাগান উলট-পালট করিয়া দিবে; সোণার সংসার ছারখার করিয়া দিয়া তাহার স্থানে দুঃখের চির-হাহাকার সৃষ্টি করতঃ জীবন-পথ অন্ধকারময় করিয়া তুলিবে, তাহাদের হইতে তোমার বংশ ছারখারে যাইবে; পিতৃ পিতামহের নাম লোপ হইবে। এইজন্যই বলিতে হয়—ধনাগম দেখিয়া বংশের উন্নতির মাপকাটি কাটিলে চলিবে না। বংশধরগণের প্রতি তাকাইয়া দেখিতে হইবে, তাহারা কি ভাবে গঠিত হইতেছে, যদি তাহারা চরিত্রবান, শিক্ষিত এবং স্বধর্ম্মপরায়ণ না হয়, তবে ধনের দ্বারা কি উন্নতি হইবে? সে ধনের ক্ষমতা কতটুকু?

রতন ঠাকুর এতদিন বেশ আমোদ-আহ্লাদে ছিলেন—বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছিলেন কিন্তু যখন দুইটী পুত্রের একটীকে বানচাল হইতে দেখিলেন, যখন সে বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কুপথে চলিতে লাগিল—কোন বাধা মানিল না। তখন তাঁহার

কুসুম-কোমল হৃদয়ে চিন্তাকীট প্রবেশ করিয়া দৈহিক বৈলক্ষণ্য আনয়ন করিল। এত বয়সের আধিক্যেও যে দেহ অচল-অটলভাবে পরিশ্রমপটু ছিল, তাহা দিন-দিন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। পান্নালাল ও দুর্গাবতী প্রমাদ গণিলেন। শিবানী শ্বশুরের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। হায়! রতন ঠাকুরের কার্য্য-কুশলতাবলে, তাঁহারই কর্ম্মের ফলে যে এ সংসার এত উন্নত, এ সংসারে এত লোক আশ্রিত, আর তিনিই যে এই আশ্রিতগণের প্রতিপালকরূপে এতদিন কার্য্য চালাইয়া সকলকে পরম সুখে সুখী করিয়া আসিতেছেন, একদিনের জন্য যে এই সুবৃহৎ সংসারে কোন গোলযোগ ঘটে নাই। এ জগতে মায়ার মায়া, তাঁহার লীলা-খেলা মানুষে কেমন করিয়া বুঝিবে? কোন্ দুষ্কর্ম্ম-সূত্র ধরিয়া যে লোকের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে, তাহা কে বলিতে পারে?

কুসুমে কীট প্রবেশ করিলে যেমন সে ক্রমশঃ জর্জ্জরিত হইয়া যায়, রতন ঠাকুরও সেইরূপ হইতে লাগিলেন। তথাপি তাঁহার পীড়ার কথা, তাঁহার মর্ম্মবেদনার কথা কাহাকেও জানিতে দিলেন না। তিনি ইহার প্রতিকারকল্পে প্রত্যহ কেবল গৃহের অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবী ও মহেশ্বরের নিকট জানাইতেন, কত সাধ্য-সাধনা করিতেন কিন্তু প্রত্যাদেশ পাইতেন—"বংশে পাপ ঢুকিলে আর নিস্তার নাই; তবে তোমাকে ইহার উচ্ছেদ দেখিতে হইবে না। তোমাকে সত্বরই আমি কোলে টানিয়া লইব। কলির পূর্ণ প্রভাব প্রকটিত হইয়াছে; চুনী আমার অংশজ নারীগণের প্রতি অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত নহে। অতএব এ পবিত্র বংশ অশেষ দুর্গতী

ভোগ করিবে, ঘোর বিশৃঙ্খলতার আবির্ভাব হইয়া কিছুদিন লোকে ইহার কলঙ্ক ঘোষণা করিবে। পান্নালাল পতিপরায়ণা শিবানীর গুণে ঠিক থাকিবে। কোন চিন্তা করিও না, চির-দিন কখন সমান যায় না।" রতন ঠাকুর আর কোন কথা বলিতেন না; কেবল বলিতেন—"মা! তবে তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক কিন্তু আমাদের দুইজনকে যেন এ সমস্ত দেখিতে না হয়।" দৈববাণী—"তথাস্তু" বলিয়াই নীরব হইতেন।

প্রত্যহ দেবীর গৃহে পূজাদির পর যে ভোগ প্রদান করা হইত, যে সকল আহারীয় দ্রব্য প্রদান করিয়া গৃহ অর্গলাবদ্ধ করা হইত—প্রতিদিন তাহা দেবীর দ্বারা প্রসাদিত হইয়াছে বলিয়া জানা যাইত। রতন ঠাকুর ও দুর্গাবতী পরিবারবর্গের ভোজন-ব্যাপার সমাধা করিয়া, অতিথি-সৎকার করিয়া সায়াহ্নে সেই অমৃতোপম দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। কিন্তু চুনী যে দিন হইতে গ্রামে নারীর অপমান করিল, সুরাপানে যে দিন ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট করিল, সেই দিন হইতে দেবী আর তাঁহাদের অন্ন-জল গ্রহণ করিতেন না—প্রত্যহ যেমন অন্ন তেমনি থাকিত। রতন ঠাকুর যোগস্থ হইয়া ইহার বিষয় জানিতে চাহিলে দেবী তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। আশা দিয়া গেলেন—"পান্নালালও শিবানীর দ্বারা কিছুদিন পরে আবার এ বংশ ভিন্নভাবে গঠিত হইবে। চুনীও আবার ফিরিবে—তবে এখন কালস্রোতের গতিরোধ করা অদৃষ্টের ফলাফল নষ্ট করা কাহার সাধ্য নহে। তোমাদের আর বেশীদিন এ ধরায়

থাকিতে হইবে না—আমি শীঘ্রই তোমাদিগকে নিজ ক্রোড়ে টানিয়া লইব।"

রতন ঠাকুর আর কোন কথা কহিলেন না; মায়ার খেলার বিরুদ্ধে ত কাহার হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই। তিনিও পানাহার ত্যাগ করিয়া মাতৃক্রোড়স্থ হইবার জন্য প্রায়োপবেশনে দেহ-ত্যাগের সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন। মা যখন তাঁহার অন্ন জল ছুঁইলেন না; তখন মাতৃভক্ত ব্রাহ্মণ আর জলগ্রহণ করিলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহাপ্রয়াণ

মনের সহিত দেহের নৈকট্য সম্বন্ধ। মন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলে দেহের পীড়া অবশ্যম্ভাবী। পুত্রের অবস্থা-দেখিয়া রতন ঠাকুর প্রথমতঃ বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, শরীরও খারাপ হইয়া গিয়াছিল কিন্তু যখন দেবী তাহাকে প্রত্যাদেশ দ্বারা সমস্ত ভবিষ্যৎ বাণী শ্রবণ করাইয়া দিলেন, তখন তাঁহার শোক করিবার কোন কারণ রহিল না।

মায়ার মায়ায় এই জগৎ পরিচালিত, তিনি যখন যে ভাবে লীলাখেলা করিতে ইচ্ছা করেন, জগতে মানুষ তখন সেইভাবে তাহার খেলার পুত্তলী হইয়া চালিত হয়। সংসারের নিয়মই এই—কখন উত্থান, কখনও পতন; কখন সুখ, কখন দুঃখ—চক্রের ন্যায়

পরিভ্রমণ করিয়া মানবের অদৃষ্টনেমীর গতিবিধান করিতেছে; অতএব ইহার জন্য শোক করা বৃথা।

রতন ঠাকুর দৃঢ়চিত্ত হইলেন। অবসাদ দূরে ফেলিয়া দিয়া পূতসলিলা ভাগিরথীর পবিত্র তীরে প্রায়োপবেশন করিলেন। অনশনে সজ্ঞানে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া মাতৃক্রোড়প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র পান্নালাল শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে সাধন-সিদ্ধ পিতার অন্তিম প্রার্থনা সকল পূর্ণ করিতে লাগিলেন। তুলসীকাননমধ্যে আসন প্রস্তুত হইল; অহোরাত্র ভগবদ কথায় সেস্থান পবিত্রীকৃত হইতে লাগিল। তাহার নায়ক হইলেন—তাঁহাদের কুলগুরু পরমানন্দ অবধূত।

রতন ঠাকুরের মহাপ্রস্থানের কথা শ্রবণ করিয়া গ্রামবাসী সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল; এবং তাঁহার সহিত অন্তিম সাক্ষাৎ করিতে সকলেই জাহ্নবীতীরে সমাগত হইল। সাধকের ইচ্ছা—মৃত্যু এবং তাঁহার তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তাঁহার সেই সাধন-তেজোজ্জ্বল দেহ জ্যোতি, সেই হাস্যরসপূর্ণ সমুজ্জ্বল বদনমণ্ডল যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইল। মৃত্যুজন্য একটুও বিষাদ-ভাবের তিলমাত্র ছায়াপাত তাহাতে হয় নাই। কোন প্রার্থীততম প্রদেশে যাইবার জন্য মানবের যেমন একটা আগ্রহ বর্দ্ধিত হয়, প্রাণ যেমন আনন্দে পুরিয়া উঠে, ঠাকুরেরও সেই ভাব—মুখ হাসিভরা, প্রাণ পুলকপূর্ণ।

মৃত্যু দেহের অবস্থান্তরমাত্র। কৌমার-যৌবন ও বার্দ্ধক্যে যেমন দেহ ক্ষণে ক্ষণে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, বাল্যে যে আমি ছিলাম, যৌবনেও

সেই আমি অবস্থান্তরিত হইয়াছি এবং এক্ষণে বার্দ্ধক্যেও সেই আমিই জরাজীর্ণ হইয়া স্থবীর হইয়া পড়িয়াছি, অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে মাত্র কিন্তু আমি সেই আমিই আছি। কর্ম্মফলভোগে, বয়সের আধিক্যহেতু এই দেহও অবস্থান্তরিত হইতেছে—মৃত্যুর পর ইহা নবভাবে গঠিত হইবে—ইহা যাহার জ্ঞান থাকে, যিনি বুঝিতে পারেন—নববস্ত্র পরিবর্ত্তনের ন্যায় মৃত্যু দেহান্তরপ্রাপ্তিমাত্র; অবিনাশী আত্মার ইহাতে কিছু যায় আসে না, তাঁহার মৃত্যু নাই, ক্ষয়-ব্যয় নাই—তিনি মৃত্যুকে ভয় করিবেন কেন—তাহার জন্য কাতর হইয়া কেনইবা শোক করিবেন? তিনি বরং মনে করিবেন যে মাতৃক্রোড় বিচ্ছিন্ন হইয়া এতদিন সংসারে মত্ত ছিলাম, আপন গৃহ ছাড়িয়া এতদিন প্রবাসবাসী হইয়া কত দুঃখ-কষ্টভোগ করিতেছিলাম—এক্ষণে তাহার অবসান হইল। মহামায়া এতক্ষণ পুত্রকে লইয়া পার্থিব ক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন, কতপ্রকার খেলায় হাসাইয়া, নাচাইয়া, এইবার তাহাকে কোলে লইয়া স্তন্যদুগ্ধ পান করাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিতেছে—তাই মৃত্যুরূপ বাহু প্রসারণে কোলের ছেলে কোলে টানিয়া লইতেছেন। মৃত্যু মায়ের ক্রোড়প্রাপ্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ জ্ঞান যাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে; মৃত্যুকে এইরূপ ভাবে যে হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিয়াছে—তাহার মৃত্যু জন্য অবসাদ আসিতে পারে না।

মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবই কৃতান্তের বিভীষিকা দর্শনে ভীত, ত্রস্ত, ব্যতীব্যস্ত এবং কাতর হইবে, সাধক-হৃদয়, আজীবন যে মায়ার মায়া বুঝিতে পারিয়াছে—মৃত্যুকে যে মাতৃ অঙ্কে তুলিয়া দিবার বন্ধু

বলিয়া জানিয়াছে, সে সদাই তাহার জন্য প্রস্তুত, তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অহরহঃ উদ্‌গ্রীব।

সাধকপ্রবর **রতন ঠাকুর** অন্তিমের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন আর **পরমানন্দ অবধুত** তাঁহাকে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি সদ্‌গ্রন্থ হইতে নানাবিধ সৎকথা শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। তৃতীয় দিনে অহোরাত্র হরিনাম-স্রোত প্রবল বন্যার ন্যায় সুরধুনী-তরঙ্গে ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। প্রাতঃকালে **রতন ঠাকুর শ্রীগুরু পরমানন্দ অবধুত**-পদে প্রণিপাত করিলেন, গুরুও প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আজ তিনদিন হইল তিনি আহারাদি কিছুই করেন নাই, যেদিন হইতে **মহামায়া** ভোগ গ্রহণে বিরত, **রতন ঠাকুরও** সেইদিন হইতে পানাহার ত্যাগ করিয়াছেন, সতী **দুর্গাবতী** পতিগতপ্রাণা, পতির কার্য্য অনুকরণে চিরদিন অভ্যস্থা, তিনিও সেইদিন হইতে গোপনে পান-ভোজন হইতে বিরত হইয়াছেন। স্বামী মৃত্যুজন্য প্রস্তুত হইতেছেন—তিনিও প্রস্তুত কিন্তু তাঁহার বাহ্যিক ভাব দেখিয়া কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না, সকলে বরং বলিতে লাগিল,—"মাগীর স্বামী চিরজীবনের জন্য চলিয়া যাইতেছে—তাহার জন্য কিছুমাত্র দুঃখ বা শোক ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, ওঃ কি কঠিন প্রাণ! **দুর্গাবতী** তখনও বধুমাতাকে সাংসারিক অনেক কথা বুঝাইয়া দিতেছেন, বলিতেছেন—"মা! হাতের পাঁচটা আঙ্গুল যেমন সমান নয়—তেমনি বংশের সকল ছেলে সমান হয় না। তুমি তাহাকে পেটের ছেলের মত জ্ঞান করিবে।" ইত্যাদি কত

উপদেশ দিতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্রের স্বভাবদোষ জন্য কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিতে নিষেধ করিতেছেন, যাহাতে সে ভাল হয়, পান্নুকে বলিয়া তাহার চেষ্টা করিতে বলিতেছেন। তখনও তিনি বধুমাতাকে অনুরোধ করিতেছেন—মায়ার টান তখনও তাঁহার এত প্রবল।

রতন ঠাকুরের ন্যায় মহাত্মার মৃত্যুতে সকলেই নিরানন্দ; পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সাধকের সেই পবিত্র সৌম্যমূর্ত্তি শেষ দর্শন করিতে ঘাটে আসিয়াছে কিন্তু চুণীলাল সে ত্রিসীমায় আসে নাই; সে জানে ইচ্ছা করিলেই কি মরিতে পারা যায়? বাবার এ পাগ্‌লামী। এ সময় পাছে কেহ কোন কথা বলে, কোন সৎ উপদেশ দেয়—এইজন্য সে গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

চুণীলাল এখন নানাপ্রকার নেশায় উন্মত্ত; চরিত্রদোষও কম নহে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—তখন পুরাদমে খৃষ্ট-পাদরীগণের প্রচারকার্য্য পূরাদমে চলিতেছিল,—চুণী তাহাদের সহিত মিশিল, বন্ধুবান্ধবগণের সহিত হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিয়া সকলকে খৃষ্টান করিবার জন্য স্থানে-স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; তবে নিজে তখনও খৃষ্টান হয় নাই—জাতি নষ্ট করে নাই। কিন্তু এরূপভাবে বেশীদিন থাকিলে যে মতি স্থির রাখিতে পারে—তাহা ত বোধ হয় না। বড়লোকের ছেলে, পয়সার অভাব নাই, কাজেই বন্ধুগণ যখন তাহাকে নানাবিধ প্রলোভন দেখাইতেছে, বলা যায় না ভবিষ্যতে কি হয়। ভাল লোকের পরামর্শ গ্রহণ করা, তাঁহাদের সহবাসে

দুই দণ্ড অবস্থান করা এখন সে ছাড়িয়া দিয়াছে। পাড়ার কোন ভাল লোককে আসিতে দেখিলে, পাছে তিনি কোন সৎ উপদেশ দেন—এইজন্য সে পূর্ব্ব হইতে নয়নের বাহির হইয়া যাইত। নব অনুরাগে এ সকল অসম্ভব নহে। মন্দ জিনিস মন্দ হইলে বরং তাহা হইতে কিছু পাইবার সম্ভাবনা থাকে, ভাল জিনিস মন্দ হইলে তাহা হইতে লাভের কোন আশাই থাকে না; একেবারে ব্যবহারের বাহির হইয়া যায়। চূণীলালের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে।

ভাল-মন্দ লোক সকল সময়ে সকল দেশেই ছিল, আছে এবং থাকিবে। যাঁহারা ভাল লোক—চূণীলালকে দেখিলে, তাঁহার অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহারা মরমে মরিয়া যাইতেন; কিসে তাহার মতি-গতির পরিবর্ত্তন হইবে—তাহার চেষ্টা করিতেন, আর যাহারা মন্দ লোক—পরের অনিষ্ট চিন্তা করা যাহাদের স্বভাব—তাহারা তাহাকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিত, অভাব হইলে গোপনে অর্থসাহায্য করিত, এক সময়ে ইহার চতুর্গুণ আদায় করিয়া লইবে ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইত। কারণ রতন ঠাকুরের বিশাল বৈভবের অর্দ্ধেক মালিক যে—চূণীলাল। বৃদ্ধ একবার পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে ত হয়, তার পর দেখা যাইবে। যাহাদের মন অধর্ম্মে গঠিত, হিংসায় পরিপূরিত, তাহারা চূণীলালকে এইরূপ কুপথে পরিচালিত করিয়া আপনাদের অভিষ্টসিদ্ধি করিতে লাগিল! যাহা হউক—ইহাতে রতন ঠাকুরের যায় আসে কি, জগতের ত কিছুই চিরস্থায়ী নহে?

আজ প্রাতঃকাল হইতেই রতন ঠাকুর দেবভাবাপন্ন; যে

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে; তাহার সহিতই তিনি হাসিমুখে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন এবং বলিতেছেন,—"আজীবন একত্র ছিলাম, যদি কখন কোনপ্রকার দোষ করিয়া থাকি, যদি আমার দ্বারা কোনপ্রকার অন্যায় আচরণ হইয়া থাকে—সকলে আমাকে মার্জ্জনা করুন।" সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ **ঠাকুরের** এই বালকভাব দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছে—সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে, "**ঠাকুর**! আপনার ন্যায় সাধকের সহবাসে আমরা পবিত্র হইয়াছি, গ্রাম পবিত্র হইয়াছে, আপনার অভাবে আমাদের যে কি অশুভ হইবে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না আপনার কোন দোষ থাকিতে পারে না—বরং আমরাই দোষী, আমাদের মার্জ্জনা করিতে হইবে বলিয়া সকলে কত পরিতাপ করিতেছে।" **পান্নালাল**ও গুরু **পরমানন্দ ঠাকুর** আজ পাছে পাছে ঘুরিতেছেন, পুত্রের ভাব আজ বিষাদজড়িত, কোন ভীষণ অশনিপাত হইবে জানিতে পারিলে লোকের যে অবস্থা হয়, **পান্নালালের**ও আজ সেই দশা হইয়াছে। পিতা পুত্রের ভাব দেখিয়া সান্ত্বনাচ্ছলে বলিতেছেন,—"বৎস! পিতা মাতা লোকের চিরদিন বাঁচে না। এক সময় না এক সময় সকলকেই এই বিপদে আক্রান্ত হইতে হয়। এ জগত কাহার চিরবাসস্থান নহে, ইহার সুখ-সচ্ছন্দ ক্ষণিকমাত্র; যদি চির-শান্তিসুখ অনুভব করিতে চাও—কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মফলের অবসান করিয়া, বিধিনির্দ্ধারিত ধর্ম্মকর্ম্মে মতি স্থির রাখিয়া সংসার-ভোগান্তে সেই শান্তি-নিকেতনে যাইতে পারিলে তবে সুস্থির হইতে পারিবে—যথার্থ শান্তি-সুখের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া মন-প্রাণ সুশীতল করিতে

পারিবে। চিন্তা করিও না বাপ্! গুরুদেব রহিলেন, ভবনদীর কাণ্ডারী তিনি, তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করিও। আমার সময় হইয়াছে। আমি চলিলাম।

বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় গঙ্গায় জোয়ার আসিলে, নদী কুলে কুলে ভরিয়া গেল। তুলসীমণ্ডপ পবিত্র সলিলে ভাসিতে লাগিল। জননী জাহ্নবী যেন তরঙ্গরূপ হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আয় বাপ্! পাপীর পাপরাশি নষ্ট করিয়া আমি মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, আজ তোমার মত সাধককে কোলে লইয়া আমি সে মলিনত্ব প্রক্ষালন করিয়া ফেলি। আমি সকলের পাপ নিজ অঙ্কে ধারণ করিয়া কলুষিত হই, আমার সে কলুষ নাশ করিতে হইলে তোর ন্যায় পরম ভক্তকে অঙ্কে ধারণ করা ভিন্ন আর যে উপায় নাই।" মা যেন ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিলেন।

সময় হইয়াছে দেখিয়া **রতন ঠাকুর** বদ্ধ পদ্মাশনে বেদীর উপর ধ্যানোপবিষ্ট হইলেন। চারিদিকে হরিধ্বনী হইতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টার পর সেই বিশাল সাধক-শরীর জলের উপর ভাসিতে লাগিল। যতক্ষণ প্রাণপাখী দেহপিঞ্জরে অবস্থান করিয়াছিল—ততক্ষণ নাভিনিম্নে করপল্লব সংস্থাপন করিয়া ভক্ত বীরের মত বসিয়াছিলেন্। প্রাণপাখী যখন উড়িয়া গেল, বিদেশ ছাড়িয়া যখন স্বদেশে **মহামায়ার** চরণতলে গিয়া পৌছিল—তখন তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ জলের উপর ভাসিতে লাগিল। **পান্নালাল** উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। **দেবীপুরের** গঙ্গাতীর লোকে লোকারণ্য হইল।

সকলেই বলিল,—"যাহা গেল, দেশ যে রত্ন হারা হইল, বোধ হয় তাহার পূরণ আর হইবে না।" আশ্রিত, প্রতিপাল্য সকলে পিতৃহারা হইয়া গগনভেদী ক্রন্দনে ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিল।

রতন ঠাকুরের বিশাল ভদ্রাসন ভাগীরথীর তীরেই অবস্থিত ছিল। *ঠিক এই সময় সংবাদ আসিল—কর্ত্রী ঠাকুরাণী* **মহামায়ার** *মন্দিরে অচেতন, তাঁহার সংজ্ঞা নাই।* **পরমানন্দ** ও **পান্নালাল** তাড়াতাড়ি গৃহে গমন করিলেন। দেখিলেন—দেবতার পদতলে সোণার কমল শোভা পাইতেছে আর দেবী বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন। ভক্ত দম্পতীকে পদাশ্রয় দিয়া মায়ের আনন্দের সীমা নাই। পরীক্ষান্তে প্রতিপন্ন হইল,—স্বাধ্বী ধরণীতলে আর নাই; দেবীকে মনের কথা সমস্ত নিবেদন করিয়া পতির অনুগমন করিয়াছেন।

হিন্দু-পত্নী এইরূপেই পতির অনুগমন করে; ইহার ভিতর কপটতা নাই। যে যথার্থ পতিকে দেবতা বলিয়া চিনিয়াছে; পতি-প্রেমে যে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছে; তাহাকে তুমি কিছুতেই রাখিতে পারিবে না। সে এইরূপে হাসিতে হাসিতে মৃত পতির প্রণয়রূপ চিদাকাশে মিশিয়া এক হইয়া যাইবে। অর্দ্ধ অঙ্গ নষ্ট হইলে অপরার্দ্ধ কতক্ষণ থাকিতে পারে? হিন্দু পতি-পত্নী যে ভিন্না-ধারে—একাঙ্গ, একের নাশে অপরের নাশ অবশ্যম্ভাবী; ঠিক প্রণয় হইলে—কুশণ্ডিকার মন্ত্রের ন্যায় পতি-পত্নীর হৃদয়ে-হৃদয়ে একত্ব সম্পাদিত হইলে হিন্দুস্ত্রীর পক্ষে ইহা আর বিচিত্র কি?

পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। মাতাও তাঁহার সহগমন করিলেন।

এতক্ষণ যাহারা নির্ম্মম স্বভাব দেখিয়া সতীকে নিন্দা করিতেছিল—তাহারা আবার সকলেই দুর্গাবতীর পাতিব্রত্য, তাঁহার আদর্শ পতি-অনুরাগ দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, শতমুখে তাঁহার সতীত্বের ব্যাখ্যা করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। পান্নালাল দুর্ব্বিসহ শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে সগণসহ পিতা-মাতার শবদেহ শ্মশানে নীত করিলেন এবং চন্দনকাষ্ঠের চিতা প্রস্তুত করিয়া পরকালসম্বল হরিধ্বনিসহকারে এক চিতায় তাঁহাদের দেহ ভস্মীভূত করিলেন।

হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চরণ আর গৃহগমনে উৎসুক নহে। পান্নালাল যে অমূল্য রত্ন দেবীপুরের শ্মশানঘাটে ভস্মীভূত করিল, যে নিধি কালের কবলে তুলিয়া দিল, হায়! জগৎ বিনিময় করিলেও কি তাহা আর পাওয়া যাইবে? পরমানন্দ তাহাকে অশেষপ্রকারে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে আনিলেন কিন্তু সেই শূন্যময় গৃহে আসিয়া পান্নালাল তিলমাত্র অবস্থান করিতে পারিলেন না। পত্নী শিবানীর সেই মর্ম্মভেদী ক্রন্দন, আত্মীয়স্বজনবর্গের হা হুতাশে তাঁহাকে সাতিশয় কাতর করিয়া তুলিল। গুরু পরমানন্দ রমণীগণকে নানাপ্রকারে প্রবোধ প্রদান করিয়া পান্নালালকে লইয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন। সেখানেও ক্রন্দনের উভরোল—বৃদ্ধ স্বরূপ ঘোষ মৃত্তিকায় পড়িয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছে। সে কোন কথা বলিতে পারিতেছে না। একে সে বিষম তোতলা, বহুকষ্টে কথা কহিয়া থাকে—তাহার উপর শোকে বাক্যরোধ হইয়া গিয়াছে; তাহার সে শোকযাতনা বাস্তবিক বর্ণনাতীত—সে দৃশ্য অতীব হৃদয়বিদারক। চট্টোপাধ্যায়বংশের উপর

ভগবানের হঠাৎ এই ভীষণ অশনি-সম্পাত দেখিয়া সকলেই শোকাকুলচিত্তে তাঁহাদের বাটী আসিয়া পান্নালালকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল কিন্তু সান্ত্বনা করিবে কি, রতন ঠাকুরের সে অমায়িক ভাব, সে গভীর ধর্ম্মপ্রাণতার এবং অসীম ত্যাগ স্বীকারের বিষয় যতই তাহাদের হৃদয়ে উদয় হইতে লাগিল, ততই তাহারা সান্ত্বনা করিবার পরিবর্ত্তে অধীর হইয়া উঠিল। রতন ঠাকুর যে সকল গুণের আকর ছিলেন, গ্রামবাসী প্রত্যেকেই যে একপ্রকারে না একপ্রকারে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, এমন একজন মহানুভব লোকের অন্তর্ধানে কে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে? শুধু কি তাই— অন্নপূর্ণাসদৃশী মা দুর্গাবতীও যে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; যাঁহার পুত্রসম যত্নে, প্রাণান্ত পরিশ্রমে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতা দুঃখের লেশমাত্র অনুভব করিত না। কোনপ্রকার দুঃখ কষ্টের সূত্রপাত হইবার পূর্ব্বে দুর্গাবতীকে জানাইলে যে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার হইত; হায়! এরূপ পরোপকার ব্রতধারিণী সতী সীমন্তিনীর অভাবে কাহার হৃদয় না শতধা বিদীর্ণ হইবে? তাহারা কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়া ফেলিল। শোকের প্রথম বেগ ভীষণ বেগে হৃদয় আলোড়িত করিবার পর ক্রমে ক্রমে সমস্ত সহ্য হইয়া যায়; সকলেই আবার আপনা আপনি জগতের চিরন্তন গতি বুঝিতে পারিয়া সুস্থ হইল কিন্তু যাহার সহিত প্রাণের মিলন, যিনি আত্মার অংশরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই জ্যেষ্ঠপুত্র পান্নালালকে কেহ বুঝাইতে পারিল না, কয়েকদিন পরে তিনি বাহ্যিক কাতরতা হইতে অনেকটা মুক্ত হইলেন বটে কিন্তু অন্তর তাঁহার শোকে

দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিলে শোকের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত।

পান্নু বাবু এ জীবনে শোক কাহাকে বলে বা পিতা মাতার অদর্শন যাতনা যে কি ভয়ানক—তাহা একদিনের জন্য জানেন না, তিনি জীবনে কখন পিতা মাতার কাছ ছাড়া হন নাই; আজ্ঞাকারী ভৃত্যের ন্যায় আজীবন কেবল পাছে-পাছে ঘুরিয়া পুত্রনামের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ হেন ভক্ত পুত্রের পক্ষে পিতা মাতার চিরঅদর্শন যাতনা যে কিরূপ যাতনাপ্রদ, তাহা সহজেই অনুমেয়। এ দিকে ত এই, আর একদিকে চুণীলাল দেশত্যাগী; প্রাণের বন্ধুগণকে লইয়া মেলা দর্শনে বহির্গত হইয়াছেন। পিতার প্রায়োপবেশনের কথা শুনিয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে যে পিতার মৃত্যু হইবে—তৎসহ মাতাও যে স্বর্গগমন করিবেন—নব শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক চুণীলাল তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। ইহা কি কখন সম্ভব—ইচ্ছা করিলেই কি মরা যায়? বাবা ধর্ম্মপাগলা, কি একটা নূতন ভাব মনে উঠিয়াছে—তাই মাতিয়া উঠিয়াছেন, কিছুদিন পরে আবার সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে—গুরুদেব আসিলে মাঝে মাঝে ত ঐরূপই হইয়া থাকে। চুণী বাবু সার ভাবিয়া পুরাদমে পাপস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন; কোন বিষয় দৃক্‌পাত করেন নাই। অর্থের আবশ্যক হইলে যখন চাহিবামাত্রই পাইতেছেন, সামান্যমাত্র চিরকুট লিখিয়াই যখন এত টাকার আমদানী, তখন আর ভাবনা কি?

জগতে যে কতপ্রকার প্রকৃতির লোক আছে; তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য; মহামায়া যে কতপ্রকারে মায়ালীলা বিস্তার

করিয়া জগৎপ্রপঞ্চের কার্য্যপ্রণালী পরিচালনা করিতেছেন, তাহা কে বুঝিবে। এক ঔরষজাত দুটী পুত্র, একটী ঋষিতুল্য দেবচরিত্রসম্পন্ন; আর একটী বিকট দানবপ্রকৃতির, যাহাকে দেখিলে, যাহার ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করিলে ব্রাহ্মণবংশের কুলাঙ্গার ভিন্ন আর কিছুই অনুমান হয়-না। কি দোষে যে এরূপ হইল, এরূপ দেবদেবীর সহবাসে যে কেন এমন পিশাচের অভ্যুদয় হইল, তাহা মানববুদ্ধির অগম্য। তবে সকলেই অনুমান করিল এবং **অবধূত পরমানন্দ** বলিলেন,—"কলিতে ভাল সাধকের বংশ আর থাকিবে না; তাহার উচ্ছেদসাধন একান্ত আবশ্যক কিন্তু পাপস্পর্শ না হইলে ত কোন দ্রব্য লোপ হইতে পারে না, এতাবৎকাল এ বংশ পুণ্যের পূর্ণ প্রভাবে দেশে আদর্শরূপে প্রতিপন্ন হইয়া আসিতেছিল, কলির প্রভাব অত্যধিক হইতেছে; এ আদর্শ আর নয়নের সম্মুখে প্রতিফলিত থাকিলে পাছে লোকের চৈতন্য হয়; এইজন্য মা বিশ্বজননী তাহার উচ্ছেদসাধনোদ্দেশে এরূপ খেলা খেলিতেছেন।" অবধূতের বাক্যে সকলেই বিশ্বাস স্থাপন করিল।

অবধূত পরমানন্দ বহুদিন লোকালয়ে আসিয়াছেন! প্রাণের শিষ্য **রতন ঠাকুরের** জন্যই হিমালয়পদপ্রান্ত পরিত্যাগ করিয়া এস্থানে আগমন, নতুবা তাঁহার ন্যায় সংসারবিরাগী দণ্ডী কখন এ কলুষময় সংসারের ছায়া স্পর্শ করেন না। তিনি স্বস্থানে প্রস্থানের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। সকলে অনুনয় বিনয় করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা অবধি শিষ্যবাটী অবস্থানের অনুরোধ করিলেন। এমন পরম ধার্ম্মিক দম্পতীর পারত্রিককার্য্য তাঁহার ন্যায় দেবসদৃশ ব্যক্তির

তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়—ইহা সকলেরই ইচ্ছা; অবধূত তাহাদের আশা পূর্ণ করিলেন।

তাঁহার অনুমতিক্রমে দানসাগর শ্রাদ্ধের আয়োজন হইল। অর্থের অভাব নাই, মাসাধিককালব্যাপী এই শ্রাদ্ধকার্য্যে পারলৌকিক ক্রিয়া কলাপের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইল; এরূপ বিধিবিহিত আদ্যকৃত্য কেহ কখন দেখে নাই। এই দৈবকার্য্যে বাস্তবিক যেন দেবতাগণের আবির্ভাব হইল; দেশ বিদেশ হইতে বেদপারগ ব্রাহ্মণসকল পদার্পণ করিয়া পিতৃকার্য্যের অগ্রভাগ গ্রহণ করিলেন। লোকজনের আহারাদির ব্যবস্থা; দরিদ্রনারায়ণের বিদায়ের ব্যবস্থা যাহা হইয়াছিল—সেরূপ মহতী অনুষ্ঠান কেহ কখন চিন্তাও করিতে পারে না! অবধূতের ব্যবস্থাগুণেই এরূপ হইয়াছিল, কেবল টাকায় নহে। এ শ্রাদ্ধে সকলেই আসিয়াছিল—সকলেই প্রাণ খুলিয়া যোগদান করিয়াছিল। আসে নাই কেবল অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র চুনীলাল, অনেক বলা কহায় অশৌচ ত্যাগ করিতে একদিন আসিয়াছিল মাত্র, তাহার পর আর দেখা নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাট ভাঙ্গিল

জগতে সময়ে সময়ে এমন এক একটা ভাগ্যবান লোক জন্মগ্রহণ করে যে, তাঁহার আগমনে দেশ উজ্জ্বল, গ্রাম উজ্জ্বল, সংসার উজ্জ্বল হয়—সূর্য্যতেজ যেমন চারিদিক উজ্জ্বল প্রভায় সমুজ্জ্বল করে, সে মহাত্মার প্রভায়ও সেইরূপ চারিদিক আলোকিত ও পুলকরশ্মি পরিপ্লুত হইয়া থাকে। অস্তগমনে আবার যে আঁধার সেই আঁধার, চারিদিক তিমিরাবরণে আবরিত হইয়া লোকলোচনে বাঁধা প্রদান করে। **রতন ঠাকুর** প্রভাবান্বিত ভাস্করের ন্যায় এতদিন সংসার উজ্জ্বল করিয়া কত লোকের কত হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, কত অন্নহীনের অন্নসংস্থান করিয়া দিয়াছেন, কত আত্মীয় কুটুম্বগণকে আপনার করিয়া সুবৃহৎ সংসারের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন;. হাটে কত লোকের সমাগম হইয়াছিল, যাহা দেখিলে মানব অদৃষ্টের একটা বহু তপস্যার ফল বলিয়া, লাভের জন্য স্বতঃই লোভ হইয়া থাকে। আজ সে কীর্ত্তিমান মহামনা পুরুষ নাই, কয়েকদিন হইল অস্তমিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারই আজীবন পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত বিশাল সংসারহাট ভাঙ্গিয়া ছারখার হইবার উপক্রম হইয়াছে।

চুণীলাল সময় বুঝিয়া গৃহে আসিয়া বসিয়াছেন। দেবোপম

বাপ-মার শ্রাদ্ধে অত টাকা কার হুকুমে খরচ কল্লে? শ্রাদ্ধ আবার কি, তাহাতে এত টাকা নষ্ট করিবার কি আবশ্যক ছিল; তুমি সেই ন্যাড়া ব্যাটার পরামর্শে সমস্ত নষ্ট করেছ, আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলে কি?"

গুরুর প্রতি গালিবর্ষণ করায় **পান্নালাল** হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন, বলিলেন,—"ভাই! সাক্ষাৎ দেবতা গুরুদেবকে গালি দিও না; আমাদের যা কিছু উন্নতি, সবই ত তাঁহার কৃপায়; তিনি যে চট্টোপাধ্যায়বংশের দেবতাস্বরূপ; আমাকে গালি দাও, কটু বলো, ক্ষতি নাই। তাঁহাকে ইহার মধ্যে টানিয়া আনিয়া দোষী করিও না। তিনি সংসার-বিরাগী মুক্তপুরুষ, কেবল গ্রামবাসীর উপরোধ—অনুরোধে এ কয়দিন এখানে থাকিয়া, আমাদের গ্রাম পবিত্র করিয়াছিলেন বইত নয়?"

চুণী বাবু উচিত মত উত্তর পাইয়া আরক্তিম চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন,—"দেবতা আবার কে? নেড়া বাবাজী কি আবার দেবতা হতে পারে, দেবতার কি চেহারা অমন কদাকার; দেবতা বরং আমাদের পাদ্‌রী জ্যাডকিল সাহেব। আহা! কি সৌম্যমূর্ত্তি, কি সোণার মত রং, কি বিশাল দেহ, দেখিলে প্রাণ মোহিত হইয়া যায়। আর তোমার এবং বাবার গুরু যেন একখানা পোড়াকাঠ, কালকিষ্টে, খর্ব্বাকার।"

চুণী তখন নেশায় নিজস্ব হারাইয়াছে, গুরুকে অজস্র গালি দিতেছে, তাহা ত শ্রবণ করা উচিত নয়, পাপ স্পর্শিবার ভয়ে **পান্নালাল** তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই সময় ভারতের সর্ব্বত্র খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য মিশনারীগণ গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইত, খ্রীষ্টানধর্ম্মের সাম্য-মৈত্রী ভাব বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া সকলকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য এ সময় তাহারা ঘোরতর চেষ্টা করিতেছিল; নানাপ্রকার প্রলোভনে স্বকার্য্যও কতক পরিমাণে উদ্ধার করিয়াছিল। রাজ সরকারে উচ্চ-বেতনে চাকুরী, বিবি-বিবাহ প্রভৃতি নানাবিধ প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া এ দেশের সরলহৃদয়, দুর্ব্বলচেতা অনেক লোক খ্রীষ্টান হইয়াছিল। সে সময় দেশের যে কি দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল, কি একটা বিষম প্রলয়ঝড় যে দেশকে তোলপাড় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—তাহা চিন্তা করিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে;—হৃদয় বিষাদ-অবসাদে পূর্ণ হইয়া যায়।

দেবীপুর এই স্রোতে ভাসিবার উপক্রম হইয়াছিল। কত লোক প্রচারকদিগের মনোরম-বচন-পরিপাট্যে, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার অনুকরণ করিল, কতলোক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল, কিন্তু তাহার মধ্যে দরিদ্র হীনজাতির সংখ্যাই বেশী। যাহারা সমাজে তত মিশিতে পারিত না, ভদ্রলোক যাহাদের নিকট যাতায়াত করিত না। তাহারাই প্রতিপত্তি লাভের আশায় জাতি নষ্ট করিয়াছিল। প্রচারকদের ইচ্ছা **চুণীর** মত একজন বিশিষ্ট-ঘরের ছেলেকে খৃষ্টান করিতে পারিলে, তাহাদের শির উন্নত হয়, আদর্শ স্থাপন করিয়া আরও কত ভদ্রলোককে মজাইতে পারে, এইজন্য তাহারা মিশনারী বিদ্যালয়ে তাহাকে লইয়া কত নাড়াচাড়া করিয়াছিল, কিন্তু আজ অবধি তাহারা সে চেষ্টায় সফলকাম হইতে পারে নাই।

চুণী এখনও জাতি নষ্ট করে নাই; তবে অনাচার-অত্যাচারে কলুষিত হইয়া গিয়াছে, মেজাজ বিদেশীয়ের মত কড়াভাব ধারণ করিয়াছে, ব্রাহ্মণবংশের সে কমণীয়তা, সে ধর্ম্ম-প্রাণতা তাহাকে ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে। তাই সে পিতামাতার মৃত্যুর পর সহযোগীগণের অনুরোধে ভ্রাতার উপর নানাবিধ অত্যাচার করিতে লাগিল। পাওনাদারগণকে দেনার জন্য নালিশ করিয়া বিষয়-আশয় ক্রোক করিতে বলিল। নিরীহ ধর্ম্মভীরু **পান্না-লালকে** বিষম বিপদগ্রস্ত দেখিয়া পাড়ার অনেক লোক **পান্না-লালকে চুণীর** বিরুদ্ধে ধর্ম্মাধিকরণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিল। ব্রাহ্মণভাবাপন্ন পুণ্যপ্রাণ **পান্নালাল** কিন্তু হাসিয়া বলিলেন—"তাহাও কি কখন হয়, **চুণীকে** আমি হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছি; তাহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার মন্ত্রণাজাল বিস্তার করিয়া, আদালতে দাঁড়ান আমার দ্বারা হইবে না, ভাই হইয়া ভাইয়ের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে পারিব না, ও না হয় মতিভ্রষ্ট হইয়াছে কিন্তু আমিত ঠিক আছি, কেমন করিয়া এরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত, পিতা-মাতা ও গুরুদেবের আদেশ বহির্ভূত কার্য্য করিব? ইহা আমার দ্বারা কখনই সাধিত হইবে না।

স্বরূপ বহুদিন হইতে **পান্নালালকে** ঠিক পিতার অনুরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া জানিত, তিনি যে এ বিষয় স্বীকৃত হইবেন না, তাহাও সে বেশ ভাল জানিত, তথাপি এখন দুষ্টের দমনার্থে নানাপ্রকার কৌশলজাল বিস্তৃত করা উচিত—বিবেচনা করিয়া সে পাড়ার মাতব্বর ব্যক্তিগণকে ইহার জন্য **পান্নালালকে**

অনুরোধ করিতে বলিয়াছিল বটে কিন্তু তাঁহাকে ভ্রাতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে একান্ত অনিচ্ছুক দেখিয়া বলিল—"বা—বা-বাবাজী! তুমি বু বু বুঝ্‌ছো না; তাহা হইলে তোমাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে, বি বি বিষয়ের কিছুই তুমি পাইবে না; ওর নাম কি, সে বড় সহজভাবে বিগ্‌ড়ায় নাই; তোমাকে হাড়ির হাল করিবে—বু বু বুঝছো বাবাজী!"

পান্নালাল বলিলেন,—"ঘোষজা, তুমি যা বল্‌ছো আমি সমস্তই বুঝি, তবে কি জান, ধন বড় নয়—ধর্ম্মই বড়, ধনের জন্য ধর্ম্ম নষ্ট কর্ব্বো না, ইহাতে যতই কেন কষ্ট হউক না, অম্লানবদনে সহ্য কর্ব্বো।"

পাইক **নিতাই ডোম** বলিল—দাদাঠাকুর, ঠিক বলেছো, ধনের জন্য কেন ধর্ম্মনষ্ট কর্ব্বে? ছোটকর্ত্তা কি কর্ত্তে পারে দেখা যাক না। আমরাও ত আর মরা নয়?

পান্নালাল ধর্ম্মের প্রতি চাহিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া রহিলেন। ভ্রাতার এত উপদ্রব, এত অত্যাচার তিনি অম্লানবদনে সহ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নীরবে সমস্ত সহ্য করিতে দেখিয়া **চুনীলালের** বন্ধুগণ **চুনীর** কৃত দেনা দেখাইয়া সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ করিয়া লইল। দেনার দায়ে পাছে ভ্রাতার জেল হয়, পাছে এই অল্পবয়সে সে কলঙ্কিত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে **পান্নালাল** নিজের অংশেরও কোনপ্রকার দাবী করিলেন না, এই সকল দেনাপত্র চুক্তি করিলে নিশ্চয়ই **চুনী** ভাল হইবে, আবার দুইভাই এক হইয়া পিতামাতার নাম বজায় রাখিব।

সরল প্রাণের যেরূপ সরলভাব, ধার্ম্মিক **পান্নালাল** সেই ভাবেই কার্য্য করিলেন, ভিতরের দুরভিসন্ধি কিছুই বুঝিলেন না, বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না। পূর্ব্বদিন **চুণীর** অনুনয়-বিনয় দেখিয়া, তাহাকে নম্রভাবে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিতে দেখিয়া, **পান্নালাল** একেবারে গলিয়া গিয়াছিলেন, সে, যে বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহাকে পথের ভিখারী করিবার জন্য এইরূপ করিয়াছে, তাহা **পানু বাবু** একেবারেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি সরল-প্রকৃতিবশে বুঝিয়াছিলেন—ছেলেবেলায় অনেকেরই ঐরূপ মতিভ্রম হয়, বিশেষতঃ সঙ্গদোষে পড়িলে চরিত্রদোষ যে হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? এখন যখন সে সমস্ত বুঝিতে পারিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, এত কঠিন প্রাণ যখন এত কোমল হইয়াছে, তখন আর অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই, ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরিবে, ভাই আমার আবার বংশমর্য্যাদা বজায় করিতে যত্নবান হইবে। তাই তাহার অজস্র-দেনা হইতে মান রক্ষা করিবার জন্য, জেল হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য **পান্নালাল** নিজের বিষয়ও অকাতরে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন।

স্বরূপ ঘোষ বহুদিনের বুড়ো-কর্ম্মচারী। সংসারে কত প্রকার লোকের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া আচার-ব্যবহারের আদান-প্রদান করিয়া ভাল-মন্দ কত দেখিয়াছে, বুঝিয়াছে—সে কিন্তু বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া বলিল,—"দাদাঠাকুর! বড় ভাল কাজ করিলে না; লোক চিনিতে পারিলে না, ক্ষীরের ভিতর যে ছুরির ছুরি রহিয়াছে, তোমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য যে, সে ছুরি

শাণিত হইয়াছে—তাহা বুঝিলে না? ওর নাম কি, তোমায়ই পং
বসিতে হইল।"

পান্নালাল ঘোষজার কথা শুনিয়া মনে-মনে বিরক্ত হইলেন—মুখে কোন কথা প্রকাশ করিলেন না, কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন। ঘোষজা কর্ত্তার ভাব-গতিক দেখিয়া অন্দরে শিবরাণীর নিকট গিয়া সমস্ত বলিল। শিবরাণীও ত পান্নালালের সহধর্ম্মিনী, তাঁহার অন্তকরণ কি আর স্বামী হইতে ভিন্ন, স্বরূপের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"ঘোষজামশাই, ঠাকুরপো আজ বহুদিন থেকে যেরূপ ভাল ভাবে আছেন, তাতে যে, সে আর বিগড়াইয়া যাইবে—তাত বিশ্বাস হয় না! এ অবস্থায় দেনার দায়ে সে জেলে যাবে—ভাই হইয়া কি চক্ষে তা দেখ্‌তে পারা যায়; না হয় ছেলেমানুষ বুদ্ধির দোষে অসৎসঙ্গে পড়িয়া একটা কাজই করে ফেলেছে; তা বলে কি আর শুধরাইতে পারে না?"

স্বরূপ। মা! তোমরাও আমার কাছে খুব ছেলেমানুষ, জগতের রীতিনীতি কিইবা আর দেখেছ? আমি এরূপ কত দেখেশুনে চুল পাকিয়েছি। চুনী যে তোমাদের মজাইবার জন্য দুই-একদিন নরম প্রকৃতি দেখাইতেছে, তাহা আমি বেশ বুঝেছি। কার্য্যসিদ্ধি হলেই আবার নিজমূর্ত্তি ধরিবে।

শিবরাণী। ঘোষজা মশাই! অদৃষ্টে যদি তাই থাকে—পথের ভিখারী হওয়া, মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাওয়া যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তবে কে রোধ করিবে? আমরা ত ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া কাজ করেছি, দেখি না ধর্ম্ম কি করেন।

স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই স্বার্থান্ধ, একটু স্বার্থের হানী হইলেই তাহারা বিষধরসর্পের মত গর্জ্জিয়া উঠে কিন্তু অল্পবয়স্কা শিবানীর প্রাণের তেজ—মনের বল, ধর্ম্মে বিশ্বাস এবং স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি দেখিয়া স্বরূপ মোহিত হইয়া গেল। তাহাকে উত্তেজিত করিয়া, স্বামীর কার্য্যে হস্তারক হইবার জন্য সে শিবানীর নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু আসিয়া যাহা দেখিল, যাহা বুঝিল—তাহাতে সে মনে-প্রাণে ভগবানের নিকট তাঁহাদের প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারিল না। মানুষ যে এতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে, বিপদ-উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলেও যে গ্রাহ্য করে না—কেবল ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আত্মহারা হয়—এমন লোক সংসারে কয়জন?—হে ধার্ম্মিকের রক্ষাকর্ত্তা ভগবান শ্রীহরি—তুমি এই আদর্শ দম্পতীকে রক্ষা করিও। যাইবার সময় প্রকাশ্যে বলিল—মা! সাবধানে থেকো, ছোটবাবুর ভাবগতিক দেখিয়া, আমার কিন্তু বড় সন্দেহ হচ্ছে।

শিবানী। ঘোষজা মশাই! আমি তাঁর মুখে যেমন শুনিয়াছি, তাহাতে চুণী ভাল হইবে বলিয়াই বোধ হয়, সে ত বাহির বাটীতেই আছে, আমি একবার নিজেই তাহাকে বুঝাইয়া দেখিব নাকি? আমি ত তাহাকে সাত মাসের ছেলেটী মানুষ করিয়াছি, সে অতি-সরল, আমাকে মায়ের মত মান্য করে, অনেকদিন দেখি নাই, একবার দেখি না কি বলে?

স্বরূপ। মা! সে সরল অন্তর এখন গরলে পূর্ণ হইয়াছে, চুণী আর সে চুণী নাই। তোমার আর সেখানে যাইয়া কাজ নাই।

এই বলিয়া স্বরূপ বিদায় হইয়া গেল। নিতাই পাইক ভাল কিছু বুঝিতে পারিল না, এত গোলমালের মধ্যে মাথা দিতে, সে ছোটলোক তত ইচ্ছাও করিল না। সে ত একজন ভাল খেলুয়ার, তেমন-তেমন দেখে, কর্ত্তাগৃহিনীকে রক্ষা করিবার জন্য নিজমূর্ত্তি ধরিবে। এই মনে করিয়া সে অন্দরের কাজ করিতে লাগিল—গোবৎসের সেবাতৎপর হইল। স্বরূপ ও নিতাই এ পরিবারে অনেকদিন চাকুরী করিতেছে, বহুপুরাতন এবং বিশ্বাসী বলিয়া অন্দরেও তাহাদের গতিবিধি ছিল। কয়েকমাস আর কোন গোলমাল হইল না, দুইভাইয়ে বেশ সদ্ভাব বদ্ধমূল রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দরিদ্রতার প্রকোপে

পূর্ব্বে বলিয়াছি হীনজাতি অধঃপতিত হইলে সে বরং মধ্য-পথ হইতে ফিরিতে পারে, কিন্তু বর্ণশ্রেষ্ঠ জাতি যদি পতিত হয়—তাহা হইলে সে একেবারে চরমে না যাইয়া ছাড়ে না, মন্দ জিনিস যদি সে নিজগুণের সীমা অতিক্রম করে অর্থাৎ অত্যন্ত তিক্ত হয়, তথাপি তাহা কোনপ্রকারে গলাধকরণ করা যাইতে পারে কিন্তু অত্যুৎকৃষ্ট পরমান্ন যদি সামান্য তিক্ত বোধ হয়, তাহা হইলে আর তাহা জিহ্বায় স্পর্শ করিতে পারা যায় না। চুণীর অবস্থাও সেইরূপ, পরমান্ন তিক্ত হইয়া গিয়াছে—অতএব তাহা অসহ্য। সে যেরূপ কাজ

করিতেছে, একজন ছোটলোক ঘোর অধঃপতিত হইলেও বোধ হয় তাহা করিতে পারিত না।

চুণী কয়েকমাস একটু ভাল ছিল। তাহার কারণ বন্ধু বান্ধবগণ অর্থাদি পাইয়া যে যার আবাসে গিয়াছিল—তাহারা ত আর আত্মহারা হয় নাই? তাহারা চুণীকে কাপ্তেন বাবু ঠাওরাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে। চুণীর টাকায় বাটীর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, আবার তাহারা কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল, সময় পাইলে বন্ধুর সহিত দেখা করিয়া তাহার তোষামোদ করিতে ছাড়িত না। তাহাদের পূর্ব্বের ভাব এখন আর নাই, পূর্ব্বে যে খৃষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারের অছিলা করিয়া ইতঃস্ততঃ ঘুরিত, এখন আর তাহা করে না। এখন তাহারা যথার্থ একটী গুণ্ডার দল স্থাপন করিয়াছে, চুণী তাহার নায়ক হইয়াছে। বিনামী সম্পত্তি সমস্ত ফাঁক হইয়া গিয়াছে, যাহাদের নামে বিনামী করা হইয়াছিল, চুণী মনে করিয়াছিল, কিছুদিন পরে তাহা ফিরিয়া পাইবে, তাহা হইলে খুব সুখে কাল কাটাইতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইল না, ভগবান তাহাতে বাদ সাধিলেন। পাপের প্রতিফল হাতে-হাতে পাইবার জন্য পাপিষ্ঠকে সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। মিথ্যা দেনার ভাণ করিয়া যাহাদের নামে বিষয়বিক্রয়ের টাকা এবং জমা-জমী রাখিয়াছিল, তাহারা আর আমল দিল না, ভুলেও তাহার সহিত দেখা করিল না। এইবার চুণীলাল সমস্ত বুঝিলেন, তথাপি তাহার চৈতন্য হইল না, অর্থের অনাটন হওয়ায় সে নানাপ্রকার কুকার্য্য করিতে লাগিল। বেশ্যা ও মদিরায় সে ডুবিয়া গিয়াছে।

এখন অর্থ না হইলে চলিবে না। কাজেই গ্রামে চুরি-ডাকাতি আরম্ভ হইল। দুর্বৃত্তের কার্য্য দেখিয়া প্রতিবেশী সকলে তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইল, অপমান, গালাগালি শেষে প্রহার পর্য্যন্ত তাহার নিত্য ভোগের মধ্যে গণ্য হইল। পুত্রের কার্য্য অসহ্য হইলে পিতামাতাকেও কেহ গালি দিতে ছাড়িত না। সকলে গালি দিয়া বলিত—হতভাগা কেবল নিজে ধর্ম্ম-ধর্ম্ম করেই মরেছে, ছেলেটার দিকে একটুও নজর রাখে নাই। আমাদের জ্বালাবে বলেই বুঝি ছেলেটাকে শেষে এমন করেছিল, এখন তার ধর্ম্মকর্ম্ম কোথায় গেল, এইরূপ পাড়ার লোক প্রতিদিন ধার্ম্মিক **রতন ঠাকুর** ও **দুর্গাবতীর** কুৎসা না করিয়া জল খাইত না।

বাস্তবিক লোকে আর কত সহ্য করিবে,—এমন দিন নাই যে দিন পাষাণ্ড **চুণী** একটা না একটা বিষম গোলমাল বাধাইয়াছে। সকলে সকল সহ্য করিতে পারে—কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি উপদ্রব কে সহ্য করিবে, এখন যে পাষাণ্ডের সে দোষ পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে। **পান্নালাল** দেখিয়া শুনিয়া ঘৃণার অপমানে পাড়ায় থাকা আর যুক্তিসঙ্গত মনে না করিয়া, পত্নী **শিবানীকে** পিত্রালয়ে পাঠাইয়া গৃহত্যাগী হইবার সঙ্কল্প করিলেন। সতী পতির পদে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, বলিল—"তোমার এ অবস্থা দেখিয়া আমি কেমন করিয়া থাকিব, আমার সেখানে থাকিয়াও পেটে অন্ন যাইবে না, আর আমার ভাই ত ছাপোষা, আমার ভরণ-পোষণ করিতে পারিবে কেন, তা না হয় অনাহারে মরিলাম, তাহাতে দুঃখ নাই কিন্তু তোমার পদসেবা ছাড়িয়া আমার যে স্বর্গেও সুখ হইবে না?"

পান্নালাল দুঃখিত হৃদয়ে বলিলেন,—**শিবানী**! আমি সমস্ত বুঝিতে পারিতেছি কিন্তু উপায় কি? প্রত্যহ **চুনীর** এরূপ কুৎসা, তৎসহ পিতামাতার প্রতি অকথ্য গালিবর্ষণ ত আর শুনিতে পারা যায় না। আমি বাস্তু বিক্রয় করিয়া যৎসামান্য যাহা পাইব, তাহা গ্রহণ করিয়া, চল তোমায় পিত্রালয়ে রাখিয়া আসি, সেখানে ভ্রাতার অভাব হইলে, সময়ে-সময়ে তুমি ইহার দ্বারা কিছু-কিছু সাহায্য করিতে পারিবে। আমি প্রতি সপ্তাহে দেখা দিব, তাহার জন্য কোন চিন্তা করিও না।

শিবানী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন! মানুষের দশদশা, গ্রহের ফেরে না হয় এইরূপ হইতেছে, শ্বশুরের বাস্তু বিক্রয় করা উচিত নয়; তিনি স্বামীকে বলিলেন,—"বাস্তুতে আর কি আছে, বিক্রয় করিলেই বা কত টাকা হইবে; ইহা বিক্রয়ের আবশ্যক নাই—ইহাতে ত ঠাকুরপোর কিছু অংশ নাই; তুমি জমীদারের নিকট ইহা রক্ষা করিয়া মত্তামহীসূত্রে যে বিষয় পাইয়াছ, তাহাই বিক্রয় কর। আমার গহনা কয়েকখানি বিক্রয় করিয়া দাও, তাহাতেই আমি চালাইতে পারিব। আমাদের গ্রাম ত্যাগ করিতে দেখিলে **চুনীও** আর গ্রামে থাকিবে না—তাহা হইলে গ্রামবাসীও কতকটা নিশ্চিন্ত হইবে।"

স্ত্রীর যুক্তি বেশ সমীচীন বিবেচনা করিয়া **পানু বাবু** তাহাই করিলেন। বাস্তু বিক্রয় করিলে ত কোন লাভ নাই, আর তখনকার কালে সে ডাঙ্গা জমীর মূল্যই বা কত, আর কাহারই বা অভাব আছে যে তাহা লইবে? কাজেই জমীদারের জিম্মায় রাখিয়া

তিনি কলিকাতা বরাহনগরে শ্বশুরালায়ে সস্ত্রীক উপস্থিত হইলেন এবং শ্যালক বগলাচরণ বাবুকে নিজ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা বলিলেন—তিনি তাহাতে সাতিশয় প্রীত হইয়া স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, "ভাই! তার জন্য আর চিন্তা কি? পুরুষের ভাগ্য আর নারীর চরিত্র কখন কিরূপ ভাব ধারণ করে, তাহা কি বলিতে পারা যায়; তা তুমিও থাক না, তাতে আর ক্ষতি কি; দুইটী ছেলে পড়ালেও যে তুমি মাসে আট-দশটাকা রোজগার কর্ত্তে পার্‌বে!"

হায় অদৃষ্ট! তুমি যে মানবকে কখন কিরূপভাবে হাসাও, কাঁদাও, তাহার স্থিরতা করা দুঃসাধ্য; যে রতন ঠাকুর পরসেবায় সমস্ত ব্যয় করিয়াছেন, অকাতরে দরিদ্রসেবা করিতে যাঁহার মত লোক দেখিতে পাওয়া যাইত না, ধর্ম্মে-কর্ম্মে, সাধন-ভজনে যাঁহাকে মহাপুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, পান্নালাল যে পিতার সমস্ত গুণের অনুকরণ করিয়া পরম নিষ্পাপ, দুর্ব্বৃত্ত ভ্রাতাকে সংশোধন করিবার জন্য নিঃস্বার্থভাবে পিতার অসীম জমিদারী বিক্রয় করিয়াছেন, যিনি পিতার ন্যায় দরিদ্রসেবায় মুক্তহস্ত,—আজ তাঁহাকেই সামান্য হীন ব্যক্তির মত, সামান্য নিরাশ্রয়ের মত একজনের আশ্রয়ভিক্ষা করিতে হইল! যে শিবানী শাশুড়ী দুর্গাবতীর সহিত অন্নপূর্ণারূপে ক্ষুধিতের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছেন—মাতৃবৎ সেবায় আর্ত্তের প্রাণদান করিতে যিনি একদিনের জন্য ক্লেশ বোধ করেন নাই; আজ তাঁহাকে পতির সহিত কি দুর্দ্দশাতেই পাতিত করিলে? নির্ম্মম নিয়তি! মানুষের মনুষ্যত্ব অপহরণ

করিয়া দৈন্যের দাবদাহে দগ্ধ করিতে, তোমার ন্যায় জগতে আর কে আছে?

এত লোকজন, এত সহায়-সম্পত্তি, এখন আর কেহ নাই; আপনার বলিতে এ জগতে বুঝি তাঁহারা সকলকে হারাইয়াছেন? যাঁহাদের গৃহে থাকিবার জন্য, ঠাকুর আদরে সেবা পাইবার জন্য দেশবিদেশ হইতে লোকে লালায়িত হইয়া দৌড়িয়া আসিত, আজ তাঁহাদের চারিটী অন্নের সংস্থান নাই, কাল যে কি খাইবেন—এমন কিছু সংগ্রহ নাই; একজন লোক যে এ অবস্থায় তাঁহাদিগকে উৎসাহপ্রদান করিবে—তাহার একটীমাত্র প্রাণীও দৃষ্টিগোচর হয় না, শেষের সম্বল **স্বরূপ** ও **নিতাই পাইক** ছিল, তাহারাও প্রভুর অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে সরিয়া পড়িয়াছে। যাইবার সময় পদে ধরিয়া বলিয়া গিয়াছে—দাদাঠাকুর! যদি ধর্ম্ম সত্য হয়, যদি ভগবান সত্য থাকেন, তাহা হইলে আপনাদের এ দশা বেশীদিন থাকিবে না। সময় হইলেই ঘুণাক্ষরে আমাদের সংবাদ দিলে যদি বাঁচিয়া থাকি, তৎক্ষণাৎ আসিয়া পদাশ্রয়ে আশ্রয় লইব। এখন আর সঙ্গে থাকিয়া আপনাদের দুঃখের মাত্রা কেন বাড়াইব? যেখানেই থাকেন, আবশ্যক হইলে সংবাদ দিলেই আমরা তৎক্ষণাৎ হাজির হইব। **পান্নালাল** প্রাণের ভৃত্যগণকে বিদায় দিতে অন্তরে দারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন; তাহারাও প্রাণের দায়ে বহুকষ্টে প্রভুর মায়া কাটাইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে-ভাসিতে চলিয়া গিয়াছে। মায়ার সংসারে মায়ামুগ্ধ নয় কে, কে সহজে ঐ মায়া ছিন্ন করিতে পারে? তবে **মায়ার খেলা**

বিস্তৃত হইলে, তিনি লীলায় মত্ত হইয়া ভিন্ন খেলা খেলিলে, সমস্তই সম্ভব হইতে পারে; কিছুই অসম্ভব নহে।

পান্নালাল কিছুদিন শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিলেন। শ্বশুরালয়ে তাঁহার শ্যালক বগলাচরণ, তাঁহার পত্নী ও দুইটী পুত্র; একসময়ে ইঁহারাও রতন ঠাকুরের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, ক্রমশঃ অবস্থার বিপর্য্যয় দেখিয়া ভগ্নীপতিকে আর দায়গ্রস্থ করা ভাল নয়—তাহা হইলে হয় ত তাঁহাদিগকেও দায়ে ঠেকিতে হইবে—এই ভয়ে মানে-মানে চলিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু যে ভয়ে মানে-মানে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ভয়ই পাইতে হইল, সেই দায়েই ঠেকিতে হইল। রতন ঠাকুরের জমিদারীর তত্ত্বাবধারক পদে অধিষ্ঠিত হইয়া বগলাচরণ বেশ দুইপয়সা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, পাছে সেইগুলি ধ্বংস হইয়া যায়—এইজন্য এতদিন পরে আপন আলয় বরাহনগরে চলিয়া আসিয়াছেন। এখন যখন সত্য-সত্যই ভগ্নী ও ভগ্নীপতি তাঁহার গলায় আসিয়া পড়িল, তখন আর উপায় কি? যাঁহার খাইয়া বগলাচরণের অস্তিত্ব বজায় হইয়াছে—সমাজে মানুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, গ্রামে দশজনের একজন বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া আশ্রয় না দিয়া থাকিতে পারেন, বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মাতৃসমা; তাঁহাকে কি কষ্ট দিতে পারা যায়? তাঁহারা নিরাশ্রয় হইয়া অসীম দুঃখ পাইবেন, আর তিনি বসিয়া-বসিয়া সুখভোগ করিবেন? বগলাচরণের পক্ষে ইহা অসম্ভব। তখনকার কালে মানুষের এতটা মনুষ্যত্ব লোপ হয় নাই।

পান্নালাল দায়ে পড়িয়া শ্বশুরালয়ে আসিলেন বটে; কিন্তু ইহাতে তিনি কিরূপ প্রাণে আঘাত পাইলেন, কিরূপ অপমানিত বোধ করিলেন, তাহা তাঁহার প্রাণ জানিল, আর জানিলেন—সেই সর্ব্বান্তর্যামী, যিনি সদাসর্ব্বদা জীবের হৃদয়ে অন্তরাত্মারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। মানুষ হইয়া কে স্ব-ইচ্ছায় শ্বশুরগৃহে অবস্থান করিতে চায়? তবে শিবানী গর্ভবতী এবং একটী দুই বৎসরের শিশুকন্যা কোলে; কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া যথায়-তথায় অবস্থান করিবেন; বিশেষতঃ শিবানীর মত পরম-রূপবতী পত্নীকে সঙ্গে লইয়া, আশ্রয়হীন স্থানে বাস করা কখন কি যুক্তিসঙ্গত? এখন দেশের অবস্থা ভাল নয়। এইজন্য পান্নালাল নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বে বগলাচরণের আশ্রয়ে আসিয়া পড়িলেন, বগলাচরণও তাঁহাদের অমর্য্যাদা করিলেন না, বরং বিলক্ষণ আদরের সহিত বলিলেন,—চাটুর্য্যে মহাশয়! আপনি আমার বাটীতে আসিয়াছেন, এত আমার পরম সৌভাগ্য, আপনি কিছু মনে করিবেন না। আপনি অভিভাবকরূপে কিছুদিন এইখানে অবস্থান করিলে, আমরা বিশেষ আপ্যায়িত হইব। কুলীনের ঘরে এরূপ প্রথা ত বহুদিন চলিয়া আসিতেছে। যে সংসারে ভগ্নী ও ভাগিনেয় প্রতিপালিত না হয়, তাহাদের কৌলিন্য তত দৃঢ়তর নহে, ইহা আপনার পিতারই আদেশ এবং শিক্ষা। আমরা চিরকাল তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া; ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।

বগলাচরণের স্ত্রী ভানুমতী দেবীও শিবা-

স্ত্রীকে পাইয়া, বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। এক কথায় ভগ্নী ও ভগ্নীপতি বাটীতে আশ্রয় লওয়ায়, তাঁহাদিগকে গলগ্রহ বিবেচনা না করিয়া, তাঁহারা বিশেষ সুখী হইলেন, তাহা তাঁহাদের ভাব-গতিক দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারা গেল। পান্নালাল দায়ে পড়িয়া, প্রায়-একমাস কাল নিশ্চেষ্টভাবে বরাহনগরেই অবস্থান করিলনে, কোথাও যাওয়া বা যাইবার জন্য চেষ্টা কিছুই করিলেন না; তিনি চলিয়া যাইলে, আসন্নপ্রসবা পতিগতপ্রাণা শিবরাণী দারুণ চিন্তায় মুহ্যমান হইবে, অশেষ মর্ম্মপীড়াগ্রস্ত হইয়া অনুতাপ করিলে পাছে, প্রসবের সময় কোন বিপদ ঘটে, এইহেতু পত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য তিনি বগলাচরণের আশ্রয়ে থাকিতে বাধ্য হইলেন। প্রায় একমাস পরে শিবরাণী বিনাকষ্টে একটী নবকুমার প্রসব করিলেন। এইবার আর তথায় অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। পত্নীকে এবং বগলাচরণকে বলিলেন দেখ,—শিবপুরের উপকণ্ঠে আমার মাতুলের যৎসামান্য সম্পত্তি ছিল, তাঁহারা উভয়েই গত হইয়াছেন,—পুত্রাদিও কিছুই নাই। সে বিষয়ের আমরাই উত্তরাধিকারী, অতএব অদ্য একবার তাহার সন্ধান করিয়া আসিব, সে ত আর বেশীদূর নয়? সমস্ত ঠিক করিতে আমার দুই-চারদিন বিলম্ব হইবে, কারণ তাহার তত্ত্বাবধারণ কে করিতেছে, কাহার অধীনে আছে, তাহার কিছুই ত অবগত নহি; আজ একবার তাহার সন্ধান করিতে যাইব।

বগলাচরণ বলিলেন—চাটুর্য্যে মহাশয়! আপনি এত উতলা হইতেছেন কেন, দিদি এইমাত্র প্রসব হইয়াছেন, শরীর আদৌ

ভাল নয়, দুইটী শিশুকে লইয়া তিনি অপরিচিত স্থানে বড়ই কষ্ট পাইবেন; আর আপনার কখনও এত কষ্ট করা অভ্যাস নাই। অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়া গিয়া অবস্থা মন্দ হইয়াছে বলিয়া, স্বভাব ত একেবারে পরিবর্ত্তন হয় নাই। মানুষের দশদশা, একেবারে মুহ্যমান হইলে চলিবে কেন, আপনি শাস্ত্রপাঠী পণ্ডিত, ইংরাজী-নবীশ ত নহেন, যে বিধাতৃ-বিধান অবহেলা করিবেন। কিয়দ্দিন অপেক্ষা করুন না, জলে ত আর পড়েন নাই? বগলাচরণের কৃতজ্ঞহৃদয়ের পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহার আচরণ দেখিয়া পান্নালাল মুগ্ধান্তঃকরণে বলিলেন,—ভাই! আমি তোমার দিদিকে লইয়া এখন তথায় যাইব না, সে এখন কিছুদিন এইখানে থাক, তবে চিরকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে ত চলিবে না, ভগবান হাত পা দিয়াছেন, বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়াছেন, চিরকাল একজনের গলগ্রহ থাকা কি উচিত, চেষ্টা দেখিতে দোষ কি? তুমি ত আর পর নও, যে দুই-একবৎসর থাকিলে তুমি কাতর হইবে? বগলাচরণ ভগ্নীপতিকে বড়ই মান্য করিতেন, তাঁহার সরল স্বভাব, উদার হৃদয়, অমানুষিক চরিত্র-বল দেখিলে, বাস্তবিক তাঁহাকে কেহ ভক্তি না করিয়া বা ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। বগলাচরণ উচ্চবংশের সন্তান, তাঁহারও হৃদয় ছিল, জ্ঞানও নিতান্ত কম ছিল না, তাই তাঁহার হৃদয় কৃতজ্ঞতাশূন্য হয় নাই; চির-উপকারক ভগ্নীপতির অবস্থা বিপর্য্যয়ে তিনিও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—সে কথা ঠিক, নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা, ভগবানের অভিপ্রেত নহে, বরং তাহাতে তাঁহার নিয়মলঙ্ঘনজনিত পাপ করা হয়। তবে চেষ্টা

দেখিতে দোষ কি? তবে আপনি দুই-একদিনের বেশী কোথাও থাকিবেন না, সুবিধা না হইলে তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিবেন—শরীরকে কষ্ট দিবেন না। এই বলিয়া তিনি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন, পান্নালালও মধ্যাহ্নে আহারাদির পর পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া মাতুলালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অনুসন্ধানের ফল

শরীর ব্যাধিহীন হইলে—স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে এ জগতে মানবের অভাব কি? তাহার উপর যদি মন ধর্ম্মবলে বলীয়ান হয়, প্রাণ যদি ধর্ম্মভাবে বিভোর থাকে—তাহা হইলে এ জগতে তাঁহার কোন বস্তুরই অভাব থাকে না। পান্নালাল আজীবন ধর্ম্মপথগামী, ধর্ম্মে তাঁহার মতি চিরদিন অচল অটল—তাই শরীর বেশ কান্তিবিশিষ্ট—মন সদাই স্ফুর্ত্তিযুক্ত; এইরূপ ভয়ানক ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিলেও তিনি একদিনের জন্য বিষাদিতচিত্ত নহেন। অর্থ ছিল—গিয়াছে; এ জগতে কিছুই থাকে না; হয় যায়—যায় হয়, জগতের রীতিই এইরূপ। ধর্ম্ম বজায় থাকিলে অর্থ হইতে কত দেরি; আর অর্থ যদি নাই হয়—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? পার্থিব দ্রব্যের জন্য এত আগ্রহান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। অর্থ গিয়াছে—তাঁহাকে পথের ভিখারী হইতে হইয়াছে বলিয়া সে

একটা বিষণ্ণভাব, তাহা পান্নালাল একদিনের জন্যও বোধ করেন নাই। তিনি পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন, এখনও সেইরূপ; সদাই হাস্যানন, তবে ছোট ভাই চুণীর জন্য সময়ে-সময়ে তাঁহাকে বিমনা দেখিতে পাওয়া যাইত। মায়ের পেটের ভাই একেবারে অধঃপাতে গেল—ব্রাহ্মণবংশে কুলাঙ্গার জন্মিল; তাহার চরিত্র-হীনতাহেতু লোকে কত কথা বলে, কত গালি দেয়—ইহা অত্যন্ত অসহ্য, কিন্তু কি করিবেন—চুণী ত কথা শুনিল না, কোনরূপে সুপথে আসিল না, পিতার সমস্ত বিষয়াদি নষ্ট করিল, তাঁহাকে পথের ভিখারী করিল, তথাপিও তাঁহার চৈতন্য হইল না। অবস্থা মন্দ হইয়াও সে যদি মনের মত হইয়া কাছে থাকিত, তাহা হইলে দুরাবস্থার সময়েও তাঁহার কত সুখ! দুইভায়ে এক হইয়া থাকিলে সংসার কি অচল হয়? কিন্তু চুণী কোথায়—সে যে ঘোর দুর্ব্বৃত্ততায় মত্ত হইয়া ভ্রাতার সঙ্গ ছাড়িয়া দিয়াছে; নানা পাপে বংশের মান-সম্ভ্রম নষ্ট করিতেছে। হায়! কেন সে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিল; কেন সে ভ্রান্তমতি হইয়া বিপথে গমন করিল?

নাতুলালয়ে আসিবার সময় পান্নালাল একবার চুণীর সন্ধান লইয়াছিলেন। যা হবার, তা ত হইয়া গিয়াছে; এখন যদি সে ভাল হয়, মানুষের মত থাকিতে চায়—তাহা হইলে এখনও দুইভায়ে একত্র থাকিলে পুনরায় জীবনের পথে উন্নতি হওয়া অসম্ভব হয় না। পান্নালাল কনিষ্ঠ সহোদরকে শিশুকাল হইতে মানুষ করিয়াছেন—তাই তাহার মায়া তিনি ভুলিতে পারেন না— এত-অত্যাচারীত হইয়াও যেন চুণীকে দেখিবার জন্য তাঁহার

মন কাঁদে, প্রাণ ব্যগ্র হয়। এই মায়ার সংসারে মানুষ **মায়ার খেলা** খেলিতে আসিয়াছে, কতপ্রকার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া, কত-প্রকার বাধা-বিপত্তির অন্তর্বর্ত্তী হইয়া যে তাহারা এই **মায়ার খেলা** শেষ করে—তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। মানুষ এই আছে এই নাই; তথাপি এই খেলাঘরের খেলা, মায়া মমতায় জালা কেহই এড়াইতে পারে না। **মহামায়া** এই বিশ্ব-ভুবনে যে মায়াজাল বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন—তাহাতে প্রবেশ করিলে আর রক্ষা নাই; তুমি যেমন কেন জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ হও না, অন্ততঃ দুকুড়ি সাতের খেলা খেলিতেই হইবে; হার জিৎ ত পরের কথা।

পান্নালাল শিবপুর গ্রামের উপকণ্ঠে আসিয়া মাতুলের সম্পত্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু এখানে ত তাঁহার কেহ পরিচিত নাই। বহুদিন হইল পিতা বর্ত্তমানে তিনি মাতুলের অন্তিম-সময়ে একবার আসিয়াছিলেন—তারপর মাতুলানীর মৃত্যুসময়ে একবারমাত্র আসিয়া ইহার সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন। পিতার অগাধ-সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিতেই সময় পাইতেন না; মাতুলের এই গোষ্পদসদৃশ ভূখণ্ড লইয়া কে আবার এখানে স্বতন্ত্র একটা বন্দোবস্ত করে? বিশেষতঃ আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় জায়গা-জমীর এরূপ দুর্ম্মূল্যতা বৃদ্ধি হয় নাই; দেশের লোক এত স্বার্থপর হয় নাই যে দুই-এককাঠা জমীর জন্য দারুণ কলহে মত্ত হইবে, ভাইয়ে-ভাইয়ে সামান্য বিষয়ের জন্য বিষম মামলা উপস্থিত করিয়া একটা অনর্থ ঘটাইবে, তখন দুই-এককাঠা জমী

অনায়াসেই লোকে দান করিয়া, লোকের স্থিতি বিধান করিয়া দিত;—স্থানাভাবে বাস করিতে পাইতেছি না শুনিলে, লোকে অকাতরে তাহার সে অভাব পূরণ করিত। তখন পরস্পর এরূপ সহানুভূতি ছিল যে একের অভাবে অন্যে সমবেদনা অনুভব করিত, পারক হইলে তাহার দায়োদ্ধার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। টাকা ধার দিয়া সুদ খাইবার ব্যবস্থা ছিল না, তাহা শাস্ত্র-সঙ্গত দোষ এবং পাপ বলিয়া তখন সকলে ঘৃণা করিত; তোমার আছে, আমার অভাব হইয়াছে; তুমি দিবার উপযুক্ত হইলে, বিনা আপত্তিতে তাহা আমাকে প্রদান করিবে—তাহার আর আশা করিবে না, আর যে একান্তই অপারক; সে আশা করিয়া দিত, কিন্তু তাহার জন্য কোন লেখাপড়া, আইন-আদালত বা সাক্ষী-সনন্দ রাখিত না। উভয়ে বাটীর পবিত্র গোয়ালঘরে যাইয়া টাকার আদান-প্রদান করিত—দেবতাকে সাক্ষ্য রাখিয়া ঋণ দান করিত, তাহাতেই বাঁধাবাঁধির আর সীমা থাকিত না, এরূপ সরলতা কি আর এখন দেখিতে পাওয়া যায়?

পান্নালালকে এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া, আবার মাতুলের এই সামান্য সম্পত্তির অনুসন্ধান করিতে হইবে—তাহা কে জানিত? তিনি কি তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে এক্ষণে তাহাই করিতে হইতেছে। তিনি পাড়ার মণ্ডলমহাশয়ের নিকট আগমন করিলেন। **যদুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়** সে গ্রামের মণ্ডল বা জমীদার, **রতন ঠাকুরের** সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল; **পান্নালালের** পরিচয় পাইয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে

তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন এবং তাঁহাদের গ্রহবৈগুণ্যের কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন—"বাবা! তোমার মাতুলের সামান্য বাস্তু জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছে; তা তুমি যদি বাস কর, আমি আজই ইহা বাসোপযোগী করিয়া দিব।" পান্নালাল বৃদ্ধের সহানুভূতি দর্শনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"মহাশয়! আপনাকে সমস্ত বিষয় বলিয়াছি; আর আপনি যখন পিতার বন্ধু—তখন অপরাপর সমস্ত বিষয়ও অবগত আছেন, এক্ষণে এখানে না থাকিলে আর উপায় কি?

যদুপতি তাঁহাকে নানাপ্রকারে সাহস প্রদান করিয়া, সেইদিনই তাঁহার মাতুলের বাস্তুর সংস্কার করিয়া দিলেন। দুইখানি চালাঘরও সংস্কৃত হইল। চারিদিকে মৃৎপ্রাচীর বেষ্টিত হইল। গৃহে গাভী, তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দু-গৃহের পবিত্রতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। তখনকার প্রকৃষ্ট দান একটী সবৎসা গাভী। যদুপতি তাহাই তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পান্নালাল বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই নিভৃত-আলয় তপোবনরূপে পরিণত হইল, ধার্ম্মিক-হৃদয় পান্নালাল তথায় মনের আনন্দে তপস্যায় ব্রতী হইলেন—যদুপতি তাঁহার উত্তম সাধক হইলেন, নানাপ্রকার সদুপদেশ দানে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে, তাঁহার জীবনের তমোময় পন্থা আলোকময় করিতে যদুপতি একদিনের জন্যও বিরত হইলেন না।

পান্নালাল আশ্রমটীকে মনের মত সজ্জিত করিয়া লইলেন। নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ পূজাগৃহের চারিধারে সৌগন্ধ বিতরণ করিতে লাগিল।

চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম সকল অনুষ্ঠিত হইয়া ক্ষুদ্র আশ্রমটীকে বেশ মনোরম করিয়া তুলিল। হোমোত্থিত ধূমের সুমধুর গন্ধে ভরপুর হইয়া, গন্ধবহ চারিদিকে ছুটাছুটী করিয়া, গ্রামের নষ্টস্বাস্থ্য বিশুদ্ধ করিয়া দিতে লাগিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার অত্যাচারে পান্নালাল অনেকদিন প্রাণ ভরিয়া প্রাণময়ী মাকে ডাকিবার অবকাশ পান নাই; বেদমাতা গায়ত্রীর আরাধনা তিনি এতদিন নামমাত্র করিতেছিলেন—এই নিভৃতনিবাসে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মাসক্তি পুনরায় দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। যদুপতি গ্রামের মধ্যে সামান্য শিক্ষিত, তবে তাঁহার নৈতিক বল অত্যন্ত প্রবল, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বিচক্ষণ বলিয়া, সকলে তাঁহাকে নেতৃপদে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তিনি মণ্ডলগিরিই করিতেন, কিন্তু এই গ্রামে থাকিয়া, তাঁহার পরকালচিন্তা কিছুই হইত না, ধর্ম্মবিষয়ে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে এ গ্রামে তাহার মীমাংসা করিবার লোক পাইতেন না। অধিবাসিবৃন্দ অধিকাংশই কৃষিজীবি; শাস্ত্রজ্ঞান তাহাদের নাই বলিলেই হয়—কাজেই এখানে শাস্ত্রচর্চ্চায় তৃপ্তিলাভ করা একান্ত অসম্ভব। এক্ষণে জ্ঞান-কর্ম্ম বিমণ্ডিত পান্নালালকে পাইয়া যদুপতি যারপর নাই আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। প্রত্যহই আহারাদির পর আশ্রমে বসিয়া, শাস্ত্রালোচনা তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম হইল। পান্নালাল অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও যদুপতিকে তিনি সাতিশয় মান্য করিতেন। বিনয়নম্রতায় পান্নালাল চিরদিনই নতভাব—তিনি কখন কাহার প্রতি কঠোর স্বভাব প্রদর্শন করিতেন না; ফল-ভারাবনত বৃক্ষ যেমন সদাই অবনত থাকে, ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে

সে যেমন ছায়াদানে পার্থক্য প্রদর্শন করে না; পান্নালালও তদ্রূপ সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতেন। কাহাকেও ঘৃণা বা কাহারও প্রতি দ্বেষ, হিংসা করিতে, তিনি আদৌ অভ্যস্ত ছিলেন না। এইজন্য গ্রামবাসী ইতর, ভদ্র সকলেই তাঁহার নিকট আনুগত্য স্বীকার করিল। পান্নালাল বেশ মনের আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। প্রতিমাসে একবার কিম্বা দুইবার বরাহনগরে যাইয়া স্ত্রীপুত্রগণের সংবাদ লইয়া আসিতেন। তিনি অতি-নিকটেই মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া, শিবাণীও আর তাঁহার জন্য তত উতলা হইতেন না, কেবল সময়ে-সময়ে বলিতেন—চুণী কি সত্য-সত্যই দেশছাড়া হইয়া গেল, আর কি তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ঘরের একটা ছেলে এমন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ভগবান কি তাহার প্রতি মুখতুলে চাহিবেন না?

ধার্ম্মিক-হৃদয় কি চমৎকার জিনিস—তাহাতে কুটিলতার লেশমাত্র নাই। যে চুণীলাল তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, পথের ভিখারী করিয়াছে, শেষে অন্নের সংস্থান পর্য্যন্ত যাহার অত্যাচারে নষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য কিছুমাত্র কষ্ট নাই—একদিনের জন্যও তাহার অহিত-চিন্তা পতি-পত্নীর মনে স্থান পায় নাই। সর্ব্বস্ব যাক্ কিন্তু চুণী কিসে ভাল হইবে, দশজনের একজন হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিবে, অহরহঃ এই চিন্তা তাঁহাদের হৃদয় আলোড়িত করিয়া থাকে, পতি-পত্নীতে সদা-সর্ব্বদাই ত বলিয়া থাকেন—মহামায়া! যেরূপ খেলা খেলিবার ইচ্ছা হয় খেলাও, আমাদের যত

পরীক্ষায় ফেলিয়া রাখিতে হয় রাখ, কিন্তু চুণীর মতিগতির পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে, এসকল পরীক্ষায় আমরা অম্লান বদনে উত্তীর্ণ হইব। মা, সুখ-দুঃখের বিধান কর্ত্রী তুমি, যখন যাহা সঙ্গত বিবেচনা করিতেছ, যাহাতে আমাদের কল্যাণ হইবে—কল্যাণময়ী তুমি, তাহাই বিধান কর। কষ্টও তোমার,—সুখও তোমার সৃজিত, তবে মনকে দৃঢ় করিয়া দাও, যেন আমরা তোমার আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া, উভয়কেই সমভাবে আলিঙ্গন করিতে পারি, সুখে আত্মহারা এবং দুঃখে মুহ্যমান হইয়া, যেন তোমাকে ভুলিয়া না যাই, সকলে যেন একসঙ্গে, একপ্রাণ হইয়া, তোমার এই খেলাঘরে খেলা করি, খেলার সাথী বলিয়া কখন যেন কাহার সহিত কলহ-বিবাদ করিতে না হয়।

শিবরাণী ও পান্নালাল প্রতিদিনিই দেবদেবীর নিকট এই প্রার্থনা করিতেন। এরূপ নির্ম্মল চরিত্র তখন আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, মাতৃগর্ভ হইতেই তাঁহারা এইরূপ স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাই এদেশবাসী লোকের জ্ঞান-গরিমা, কর্ম্ম-মহিমা এত প্রোজ্জ্বলরূপে সমগ্র জগতীতলে এতদিন পূজা পাইয়া আসিতেছে। অধুনা যিনি যাহাই বলুন, স্বকপোল-কল্পিত ইতিহাসে যেমন করিয়াই লিখুন, ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে সকলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। স্বামীর ধর্ম্ম-কর্ম্মে ব্যাঘাত হইতেছিল, বাসচ্যুত হইয়া এতদিন তিনি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে মা তাঁহার মনোভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছেন, মনের মত তপস্যার নিভৃত স্থান মিলাইয়া দিয়াছেন, শুনিয়া শিবরাণী বিশেষ সুখী হইলেন।

চুণীর কথা স্মরণ করাইয়া দিলে পান্নালাল বলিলেন—সে, যে এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাহার কিছুই জানি না, তবে দুই-একজন বন্ধুবান্ধবকে বলিয়াছি, তাহারা তাহার সন্ধান লইতেছে। এই বলিয়া স্ত্রীকে আশ্বাস প্রদান করিতেন। চুণী শিবানীর দেবর, শ্বশুরের বংশধর, তাহার অধঃপতনে শ্বশুরকুলের কলঙ্ক হইবে—তাঁহার কুলক্ষয় হইবে, ইহা তখনকার স্ত্রীলোকের অসহ্য হইত বলিয়াই স্বামীকে তাহার জন্য অনুরোধ করিতেন। হায় পাষণ্ড চুণী এমন দেবদেবীকেও জ্বালাতন করিয়াছে, তাঁহাদের সাধনার পথে কাঁটা দিয়াছে, অবশেষে ইহারা না ছাড়িলেও সে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় রতন চাটুর্য্যের দুইটী পুত্রকে লইয়া দেবী মহামায়া দুইপ্রকার খেলা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অর্থহীন হইলেও জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মপথগামী, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, আর কনিষ্ঠ অর্থহীন ত বটেই, তাহার উপর পাপাচারী, পরস্ত্রী কাতর, লোভী, স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন। দেবি! এতদিন তুমি এই পবিত্র বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে তাহাদিগকে উন্নতীর চরমসীমায় উন্নীত করিয়া শেষে এমন বিভৎস খেলার সূত্রপাত করিতেছ কেন মা? তাহা জানি, ধার্ম্মিকের প্রতি এরূপ পরীক্ষা যে চিরদিন সমভাবে চলিয়া আসিতেছে—কিন্তু রতন ঠাকুর যে প্রতিকার্য্য তোমাকে না বলিয়া অনুষ্ঠান করিতেন না, এই কি মা তাহার প্রতিফল? অথবা তুমি উন্নতি অবনতির সীমা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সময়ে-সময়ে এইরূপ খেলা খেলিয়া থাক। বিধির বিধানকর্ত্রী তুমি—তোমার স্বাধীনতন্ত্রের খেলা-ঘরের ক্রীড়ার পুত্তলী আমরা কি বুঝিব? মায়ার অন্ধ করিয়া রাখিয়াছ,

স্বরূপ ত কিছুই দেখিতে দিতেছ না, তাই বলি মা! আর আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোক ঢাকা বলদের মত?

ছোট ভাই যতই কেন দুর্বৃত্ত হউক না, ধর্ম্মভীরু কনিষ্ঠগতপ্রাণ **পান্নালাল** কিন্তু ভ্রাতৃ-বিরহ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না—**চুণী** কেমন আছে, কোথায় কি অবস্থায় বাস করিতেছে—দুঃখে কি সুখে আছে—জানিবার জন্য **পান্নালালের** প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; তাই চারিদিকে লোক পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাকে অন্বেষণ করিতে হইল না—সে আপনি আসিয়া দেখা দিল—ভ্রাতাকে পাইয়া সরলপ্রাণ **পান্নালাল** যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন—বলিলেন, "**চুণী,** কেমন আছিস্ ভাই? যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন পাগলামী ছাড়, আয় দুইভাইয়ে মিলে-মিশে এইখানে থাকিয়া আবার বাপ-পিতামহের নাম বজায় করিতে চেষ্টা করি।"

চুণী দেখিল—দাদা, অরণ্য কাটিয়া নগর বসাইয়াছে; মামার জঙ্গলময় বাস্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বাসোপযোগী করিয়াছে; ইহার ত অর্দ্ধেক অংশ আমার প্রাপ্য। তবে ছাড়া যায় কেন, এই মনে করিয়া সে কিছুদিন দাদার সহিত বাস করিতে মনস্থ করিল, দাদাকে নানাপ্রকার সৌজন্য দেখাইয়া তাঁহার প্রাণ গলাইয়া দিল। ভিতরে বিষের ছুরি লুক্কায়িত রাখিয়া, বাহিরে অমৃতের ফোয়ারা খুলিয়া দিল। দাদা ভ্রাতৃপ্রেমে মজিয়া গেলেন।

চুণীলাল এতদিন বিবাহ করে নাই। তবে কুলোকের পরামর্শে পড়িয়া, সে একটী দরিদ্রা বৃদ্ধার বালবিধবা কন্যাকে অপহরণ করিয়া একস্থানে রাখিয়াছে। ইহার জন্য তাহার এখন খুব

খরচ-পত্রের অভাব হইয়াছে; কাজেই দাদার স্কন্ধে না চাপিলে আর চলিবে কেমন করিয়া; দুর্ব্বৃত্ত চুণীর সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া প্রাণের মধ্যে স্থান দান করিতে এ জগতে দাদা ছাড়া আর কে আছে?

চুণী বাহ্যিক কত-নম্রতা, কত-ভ্রাতৃভক্তি দেখাইয়া দাদাকে আপ্যায়িত করিল। যদুপতি কিন্তু চুণীর বাহ্যিক ভাবভঙ্গী এবং দৈহিক গঠনপ্রণালী দেখিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ভাই-অন্তপ্রাণ পান্নালাল কিন্তু খোলাহৃদয়ে বলিলেন,—"বাড়ুর্য্যেমশায়! চুণী আর খারাপ হইবে না।" পান্নালালের এই কথা শুনিয়া যদুপতি প্রাণে-প্রাণে একটু হাসিলেন, কিন্তু পান্নালালকে খুলিয়া কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আবার অশান্তি

দীননাথের রাজত্বে কেবল সুখে অথবা কেবল দুঃখে কাহারও দিন যায় না। সুখের মধ্যেও দুঃখের সাড়া পাওয়া যায়—আবার দুঃখের মধ্যে সুখের ক্ষীণালোক দেখিয়া প্রাণ উৎসাহিত হয়। নতুবা নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখের কোলে ডুবিয়া থাকিলে জগতে ঘোরতর সৃষ্টিবৈচিত্র্য ঘটিত, মানুষ পাগল হইয়া যাইত।

দুর্ব্বিসহ দুঃখে পান্নালাল জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছেন।

তিনি অটল পরীক্ষার্থী বলিয়াই, **মহামায়ার** এই বিষম-পরীক্ষায় বানচাল হন নাই—কোন কথা প্রকাশ করেন নাই, ঘোর দুঃখ হইয়াছে বলিয়া একদিনের জন্য কাহাকেও জানিতে দেন নাই। পিতার বিশাল-সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার মন কখন নীচ চিন্তায় ধাবিত হয় নাই; প্রাণের তেজ কখন কমিয়া যায় নাই। নবজাত শিশুর মুখারবিন্দ অবলোকন করিয়া, পত্নীর অকপট প্রণয়ের প্রাণমাতান ভাব অনুভব করিয়া, এই দুঃখের মধ্যেও তিনি সুখের অতুলনীয় ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তারপর **চুণী** ভাল হইয়া ঘরে ফিরিয়াছে, ভাইয়ের ভাই, অন্তরের ধন কাছে আসিয়াছে, এক হইয়া মিশিয়াছে,—ইহাতে তাঁহার প্রাণে আর শান্তি ধরে না। কিন্তু **চুণীকে** স্থান দিয়া ধূমায়িত অশান্তির অনলে যে পুনরায় ঝাঁপ দিলেন, নির্ব্বিরোধী **পান্নালাল** তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

চুণী একদিন ভ্রাতার মন রাখিবার জন্য বলিল—দাদা! আর কেন বৌদিকে বাপের বাটী রাখিয়াছেন, এখন এখানে আনিলে ভাল হয় না? দুর্বৃত্তের মনোগত ইচ্ছা, **পান্নালালের** শেষ সম্বল **শিবানীর** গাত্রের অলঙ্কারগুলি চক্ষুদান দিয়া তাঁহাদের অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত শোষণ করিয়া লয়েন।

পান্নালাল ভ্রাতার কথায় মনে কোন সন্দেহ স্থান না দিয়া বলিলেন—ভাই! এই সামান্য দিন হইল তোমার একটী ভ্রাতুষ্পুত্র হইয়াছে, এখানে কোন স্ত্রীলোক নাই, আর অবস্থাও তেমন নয় ত, যতদিন পারে বাপের বাড়ী থাকুক, শিশুটী একটু বড় হউক,

সেখানে স্ত্রীলোকের ত অভাব নাই—এ সব কাজে স্ত্রীলোকেরই দরকার।

চুণী দাদার মন বুঝিয়া আর বেশী কিছু বলিল না, বুঝিল এখন এরূপ আবদার খাটিবে না, কিন্তু সে আর কতদিন অপেক্ষা করিবে। সামান্য দুইমাসের খরচমাত্র বিনোদিনীর জননীর হাতে দিয়া অর্থের চেষ্টায় বাহির হইয়াছে, কাজেই অন্য উপায় নির্দ্ধারণ করিতে লাগিল। অনেক ভাবনা চিন্তার পর কূটবুদ্ধি চুণীলাল স্থির করিল—মাতুলের সম্পত্তি দাদার শুধু একার ত নয়—ইহাতে আমারও ত অংশ আছে! অতএব নিজমূর্ত্তি ধরিয়া ইহা বিক্রয় করিতে হইবে—তাহা হইলে এখন দুই-তিনমাস সুখে চলিবে। পাষণ্ড ইহারই অনুসন্ধানে করিতে লাগিল; দুই-একজন মাতব্বর ব্যক্তির সাহায্যও গ্রহণ করিল। জ্যাড্‌ফিল সাহেব তাহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। চুণী যদিও নিজে খ্রীষ্টান হয় নাই, তথাপি প্রচার কার্য্যে তাহার দ্বারা মিশনারী সাহেব বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন—এইজন্য চুণীর সকল কার্য্যে তিনি সাহায্য করিয়া থাকেন। অর্থাদির খুব আবশ্যক হইলে সময়ে-সময়ে যে দুই-একটাকা দিয়া সাহায্যও না করেন, এমন নহে, কিন্তু তাহাতে চুণীর কয়দিন চলিবে—তাহার খরচ যে অনেক, চরিত্র যে তাহার বশে নাই। জ্যাড্‌ফিল সাহেব চুণীর কাজ-কর্ম্মে বিশেষ বিরক্ত হইলেও স্বকার্য্য সাধনের জন্য কিছু বলিতেন না। তাহার মত একজন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, সুরূপ ও শিক্ষিত যুবককে সঙ্গে রাখিতে পারিলে, তাঁহার লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই; এইজন্য সাহেব তাহার পক্ষাবলম্বন

করিলেন। একদিন যাইয়া পান্নালালকে স্পষ্ট বলিলেন,—তুমি মামার বিষয় একলা ভোগ করিবে কেন, অর্দ্ধেক চুণীকে দাও।

পান্নালাল এইবার চুণীর মতলব বুঝিতে পারিলেন—আজ দুই-তিনমাস সে, কেন যে তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়াছে, এই-বার তাহা সম্যক উপলব্ধি হইল। এ বিষয়ের অর্দ্ধেক যে তাহার ন্যায্য পাওনা, তাহাও অনুভব করিলেন। চুণীর পক্ষে যখন সাহেব-সুবা রহিয়াছে, এত লোক যখন তাহার পরামর্শদাতা, তখন হয়ত হঠাৎ ধর্ম্মাধিকরণে নালিশ করিয়া বিষয় আদায় করিতে পারে। ধর্ম্মাধি-করণে উঠিয়া সত্যপাঠ করিতে, তখনকার নিরীহ লোকে ভয় পাইতেন; তাঁহারা জানিতেন—ধন বড় নয়, ধর্ম্ম বড়। ধর্ম্মাবতারের নিকট নিজের স্বার্থরক্ষা করিতে গিয়া পাছে কোন অসত্য কথা বাহির হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তাঁহারা কখন কোন বিষয়ের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না। পান্নালাল ত তাঁহাদেরই একজন, বিনা বাক্যব্যয়ে চুণীকে বিষয় বিক্রয় করিয়া অর্দ্ধেক টাকা দিতে প্রস্তুত হইলেন, বৃদ্ধ যদুপতি কিন্তু এ বিষয় হইতে তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিয়াছিলেন। বিষয় বিক্রয় হইলে এমন একজন পবিত্রচিত্ত সাধু ব্যক্তির দর্শন ত আর পাওয়া যাইবে না, তিনি ত আর এ গ্রামে থাকিবেন না, অতএব তিনি পান্নালালকে বলিলেন—"বাপু! একেবারে বিক্রয় করা কেন, তাহাকে ত আর ফাঁকি দেওয়া হইতেছে না; তাহার ইচ্ছা হয়—এখানে আসিয়া বাস করুন না?"

পান্নালাল বলিলেন—"বাড়ুর্য্যে মশাই! আমি তাহাকে অনেক করিয়া এ কথাও বলিয়াছিলাম, কিন্তু সে বলে—আমার টাকার আবশ্যক, আপনি টাকা দিয়া আমার অংশ রাখিতে পারেন রাখুন, না হয় বিক্রয় করিয়া ফেলুন।"

যদুপতি বলিলেন—"**পান্নালাল** তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, অভাবের সময় যেমন করিয়া হউক টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াই **চুণী** এরূপ বওয়াটে হইয়া গিয়াছে। উহাকে অধঃপাতে দিবার মূল কারণই তোমার পিতা এবং তুমি, যখন যাহা চাহিত, যদি তোমরা তৎক্ষণাৎ উহাকে তাহা না দিতে, তাহা হইলে **চুণী** আর এতদূর অগ্রসর হইতে পারিত না। অর্থই ত যত অনর্থ ঘটায়; অল্পবয়স্ক বালকের চরিত্র কলুষিত করিবার গোড়াই ত অর্থ—আর সহায়ক ত পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজন। পিতামাতা না হয় ছোট ছেলেটী আবদারে বলিয়া টাকা দিতেন, তুমি কেমন করিয়া এখনও টাকাকড়ি তাহার হস্তে তুলিয়া দিতেছ?"

পান্নালাল। বাড়ুর্য্যে মশাই! তবে কি উহাকে আপনি টাকা দিতে নিষেধ করেন?

যদুপতি। আমার মতে উহাকে অত প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল, টাকা না দিয়া দেখাই যাক্ না উহার দৌড় কতদূর?

পান্নালাল। দৌড় আর কতদূর, ও আর বেশী কি করিবে—আমাকে কেবল জ্বালাতন করিবে, পূজা-আহ্নিকের ব্যাঘাত ঘটাইবে।

যদুপতি। বাপু! পূজা-আহ্নিক ত ধর্ম্ম উপার্জ্জনের জন্য,

ছোট ভাইটীকে যদি কোন প্রকারে সৎপথে আনা যায়—তাহাও কি একটা ধর্ম্ম নয়? একটু সহ্য করিতে হইবে বই কি?

পান্নালালের প্রাণের সহিত কথাটীর বেশ মিল খাইল। তিনি আর বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া নিরস্ত হইলেন এবং ভ্রাতাকে কখন অতি-বিনীত ভাবে, কখন ভয় দেখাইয়া, কখন বা মিত্রতা দেখাইয়া বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু বুঝিবে কে, সৎকথা শুনিবার পাত্র কে? চুনী যদি কোন সৎকথা কাণে করে, তাহা হইলে কি তাহার এরূপ দুর্গতী হ'ত? সে বাস্তবিকই দাদার সদভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, নিরীহ ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল। পূজা-আহ্নিকের সময় গোলমাল করিয়া শান্তিময়-তপোবন কলহমুখরিত করিতে লাগিল।

গো-সেবা হিন্দুর মহাধর্ম্ম, যে গৃহে প্রত্যহ গো-সেবা হয়—তথায় সংক্রামক ব্যাধি তিষ্ঠিতে পারে না; আর এই গো-দুগ্ধে মানবের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি হয়—মানব পবিত্র হৃদয়ে স্বাত্বিকভাবে দীর্ঘজীবনলাভ করিতে পারে—এইজন্য গাভী হিন্দুর পূজনীয় দেবতা, প্রত্যেক হিন্দু তখন গো-সেবাপরায়ণ ছিলেন, পান্নালাল মাতুলের যে গাভীটী ছিল, প্রত্যহ দেবসেবার ন্যায় তাহার সেবা করিতেন।

একদিন গো-দোহন হইতেছে,—পান্নালাল বৎসটীকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; এমন সময় দুর্ব্বৃত্ত চুনী কোথা হইতে আসিয়া গাভীর মুখে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল।

পান্নালাল শশব্যস্তে বলিলেন—"ওরে চুনী! করিস কি,

করিস কি, ব্রাহ্মণের গাভীর গাত্রে বেত্রঘাত করিতে নাই, মহাপাপ, স্থির হ—স্থির হ।

চুণী উচ্চৈঃস্বরে রাগভরে বলিল—কেন, ইহাতেও ত আমার অর্দ্ধেক অংশ আছে; তুমি ত বলিয়াছ—মামার যাহা কিছু, তাহা আমারও অর্দ্ধেক, তবে বারণ কর কেন, আমার অর্দ্ধেক অংশ আমি যাহা ইচ্ছা করিব।

পান্নালাল ভ্রাতার অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বলিলেন—"ভাই! গরুটাকে আর মারিয়া কি হইবে, তুই অর্দ্ধেক দুধ লইয়া যা।"

চুণী অর্দ্ধেক দুধ লইয়া শ্রীমন্দিরে প্রস্থান করিল। সেদিন আর ফিরিল না।

আর একদিন দেবতাকে উৎসর্গ করিবার জন্য পান্নালাল নারিকেল বৃক্ষ হইতে কতকগুলি নারিকেল পাড়াইতেছেন। চুণী তখন ঘরে ছিল না, পান্নালাল একটী প্রতিবাসী বালককে বৃক্ষ হইতে ডাব পাড়িবার অনুমতি দিয়াছেন, বালকও বৃক্ষে উঠিয়াছে, এমন সময় চুণী কোথা হইতে আসিয়া কুঠারের সাহায্যে বৃক্ষের নিম্নদেশ ছেদন করিতে লাগিল। বালক বৃক্ষের উপর হইতে চীৎকার করিতে লাগিল; পান্নালাল বালকের চীৎকার শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন এবং চুণীর ব্যবহার দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। যদুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় সে দিন উপস্থিত হইয়া পাষণ্ড চুণীর অন্যায় আচরণ দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। তাহাকে কতপ্রকার ভয় দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু পাপীষ্ঠের হৃদয় কি সে

ভয়ে ভয় পায়? প্রাণ যার নিজের আয়ত্বে নাই, মন যার দড়িছেঁড়া বলদের মত প্রবল আসক্তির বশে অহরহঃ দৌড়াইতেছে—তাহার ভয় কোথায়? এজগতে তাহার কর্ম্মাকর্ম্ম কি আছে। চুণী কিছুতেই শুনিল না, শেষে অর্দ্ধেক অংশ স্বীকার হওয়ায় স্থির হইল এবং অর্দ্ধেক লইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল।

নির্ব্বিরোধী ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি এত অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না, সে দুই একদিন আহারাভাবে উপবাসী থাকিতে, স্থানাভাবে অনিদ্রায় দিন কাটাইতে পারে কিন্তু অহরহঃ এরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ, এরূপ মনের অশান্তি ভোগ করিতে ইচ্ছা করে না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেখিলেন,—শান্ত প্রকৃতি পান্নালালের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইতেছে, একটা পরম অনাচারী পাষণ্ডের জন্য একটী মধুর প্রকৃতি ন্যায়নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিশেষ কষ্ট পাইতেছে। তিনি আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন—"বাবা! আমি তোমাকে পূর্ব্বের মত উপদেশ দিয়া ভাল করি নাই, তুমি এখন যাইয়া ইহার খরিদ্দার ঠিক কর—আমিও বরং তোমার সহায় হইব।"

যদুপতি সহায় আছেন—কথা কার্য্যে পরিণত করিতে বেশী বিলম্ব হইল না। সন্তোষপুরের দুর্দ্দান্ত জমীদারকে ইহা বিক্রয় করা হইল এতদিনের পর চুণীর আশা পূর্ণ হইল—সে আপনার অংশের পঞ্চাশ টাকা লইয়া প্রস্থান করিল—আর দাদাকে বিরক্ত করিতে আসিল না।

তখন জায়গা-জমীর দাম এত দুর্মূল্য হয় নাই। আর ঐ সামান্য জমীর জন্য তখন লোকে তত আগ্রহও করিত না;

সকলেরই যখন কিছু না কিছু নিষ্কর জমী জমা আছে, তখন লোভ করিবে কে? বরং তখন ব্রাহ্মণকে অনেকে জমী দান করিয়া ব্রহ্মস্থাপনা করিত, হিন্দুর এ সৎপ্রবৃত্তি তখন রাজা-মহারাজার মধ্যেও বর্ত্তমান ছিল। জমীদার নরহরি বাবু কেবল পান্নালালের মত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ভ্রাতার উপদ্রব হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য এ জমী খরিদ করিলেন,—নতুবা তাঁহার অভাব কিসের? নরহরি বাবু বলিলেন—"দেখুন ঠাকুর! আমি যতদিন এ জমীর কোন বন্দোবস্ত না করি, ততদিন আপনি যেমন ছিলেন, তেমনি থাকুন, ইহাতে আমার আপত্তি নাই, আমি শূদ্র, যদি আবশ্যক হয় কিছু দিন পরে—আপনি ইহা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন, আমি ব্রাহ্মণের বাস্ত লইতে চাই না। তবে একান্ত উপকার হইবে, ভাবিয়া আমি ক্রয় করিয়াছি, সে জন্য কিছু মনে করিবেন না।"

যদুপতি ও পান্নালাল জমীদারের উদারতা দেখিয়া তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পান্নালালকে চলিয়া যাইতে হইবে না, তিনি যে এখন অনায়াসে এখানে থাকিতে পারিবেন—জমীদারের এই অনুমতিতে যদুপতি বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং জমীদারকে নানাপ্রকারে আপ্যায়িত করিয়া বেলা দেড়টার সময় তাঁহারা গৃহাগত হইলেন। আসিবার সময় যদুপতি বলিলেন—"বাবা পান্নালাল! দেখিতেছি তোমাকে ক্রমাগতই নানাপ্রকার কষ্টে পড়িতে হইতেছে, ইহার প্রশমনের জন্য তুমি শীঘ্র দীক্ষা গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমাকে আর

এত কষ্টভোগ করিতে হইবে না, সত্বর তুমি ধর্ম্মপথে বিশেষ উন্নত হইয়া অভাবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে এবং এত বাধা বিঘ্নও থাকিবে না। একটা দৈবশক্তির সংযোগ হইলে অসম্ভব কিছুই নাই।" কথাটা পান্নালালের প্রাণে লাগিল; বাস্তবিক এত বয়স হইল তথাপি দীক্ষা গ্রহণ করা হইল না; মহাপুরুষ দয়ানন্দের ন্যায় গুরু থাকিতে আমার ধর্ম্মশক্তি সঞ্চয় হইবে না কিন্তু এখন গুরুদেবের দেখা কেমন করিয়া পাইব?

যদুপতি বলিলেন—"বাবা! চিন্তা কর, স্মরণ কর, অন্তর্যামী তিনি নিশ্চয়ই দেখা দিবেন—তোমার মনোবাসনা সিদ্ধ করিবেন—তবে ছিন্নমস্তা মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চেষ্টা করিও, এ মন্ত্রের শক্তি অসীম। সেদিন আর কোন কথা হইল না। পান্নালাল আহারাদির পর একবার বরাহনগরে—যাইবার মনস্থ করিলেন। এ দুর্ঘটনার কথা একবার শিবানীকে না বলিলে নয়। শিবানী যে চুণীকে পুত্রের মত ভালবাসে, তাহাকে না দেখিলে অস্থির হয়, একবার তাহার প্রাণের দেবরের গুণের কথা বলিয়া আসিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণান্তে তিনি সেইদিনই কলিকাতায় রওনা হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাপের পরিণাম

এ জগতে পুণ্য অপেক্ষা পাপের প্রভাব বেশী। বিবেক-বুদ্ধি প্রভাবে অতি-সামান্য লোকই পাপের আপাত-মধুর প্রলোভন তুচ্ছ করিতে পারে। যাহাদের মনকে স্ববশে রাখিবার ক্ষমতা নাই, বিবেক-বুদ্ধি যাহাদের হৃদয় আলোকিত করে নাই; তাহারা সহজেই মোহিনী-মায়ামুগ্ধ হইয়া ইহার পুতিগন্ধময় পঙ্কিল-হ্রদে ডুবিয়া পড়ে। একবার ডুবিলে, একবার ইহার প্রলোভনমুগ্ধ হইলে আর সহজে ছাড়া যায় না—তখন অবিরত পাপ করিতেই ইচ্ছা হয়; মন পুণ্যের পবিত্র জ্যোতিপূর্ণ পথ আর দেখিতে পায় না; অন্ধকারে কেবল পাপের কণ্টকাকীর্ণ কুটীল-পথেই ধাবিত হয়।

পাপে একবার অভ্যস্থ হইলে মানসিক উৎসাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—আসক্তির সহস্র দ্বার উন্মুক্ত হইয়া, পাপীকে কেবল নরকের পথে টানিয়া লইয়া যায়। তখম তাহার করণীয়, অকরণীয় কিছুই বোধ থাকে না। পাপীকে পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কত প্রকার পুণ্যের পবিত্র ছবি সময়-সময় তাহার নয়নের সম্মুখে আসিয়া পড়ে কিন্তু দৃঢ়-অভ্যাসবলে সে তাহা দেখিয়াও দেখে না। এইজন্য জগতে পুণ্যাত্মা অপেক্ষা পাপাত্মার সংখ্যা বেশী; তাহাদের অত্যাচার

অশেষ প্রকারে সংসারে প্রবেশ করিয়া নরকের নক্কারজনক অভিনয় প্রতিনিয়ত প্রদর্শন করিতেছে।

চুণীলালের পাপবৃত্তি—অদ্ভুত কীর্ত্তি পাঠকবর্গকে এতাবৎকাল দেখাইয়া আসিয়াছি; ধার্ম্মিকের উপর তাহার অধর্ম্মময় চরিত্রের দারুণ দুর্ব্ব্যবহার কিরূপে তীব্রতেজে কাজ করিতেছে, আর কমনীয় ধার্ম্মিকচরিত্র তাহা কেমন অম্লানবদনে, কষ্টরাহিত্যচিত্তে সহ্য করিতেছে পাঠক তাহা দেখিতেছেন, সর্ব্বংসহা ধরিত্রী যেমন কিছুতেই টলেন না; পুণ্যাত্মাও তদ্রূপ অচল অটল, চরিত্র কোনরূপে কলঙ্কিত হইবার ভয়ে তিনি সকল কষ্ট, সকল দুঃখ, সকল নির্য্যাতন অনায়াসে ভোগ করিয়া থাকেন—ধর্ম্মে একেবারে ডুবিয়া না গেলে এত সহ্যগুণ কাহারও হওয়া সম্ভব নহে। আর এইজন্য ধার্ম্মিক **পান্নালাল** অদ্যাবধি এত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও ভ্রাতার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু **বিনোদিনী** ত আর ধার্ম্মিক নহে, সে এই কয়দিনমাত্র সামান্য কষ্ট সহ্য করিয়াই **চুণীলালের** উপর খড়্গহস্ত হইয়াছে; তাহাকে পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া অন্যের প্রতি আসক্ত হইয়াছে। **চুণী** পঞ্চাশ টাকা আনিয়া যখন তাহার হাতে দিল, তখন সে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"আমি টাকা চাই না, তুমি দূর হও"।

বিনোদিনী ব্রাহ্মণের ঘরের বাল-বিধবা, যতদিন সে গৃহে ছিল, যতদিন আপনার ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিয়াছিল—ততদিন সে দেবী ছিল—হিন্দুর আরাধ্যরূপে, বাল-ব্রহ্মচারিণীরূপে পবিত্র সংসার আলোকিত করিত, সে রূপ দেখিলে তাহার পদতলে

পড়িয়া পদধূলি লইতে সকলেরই সাধ হইত, সে পবিত্র মধুময়ভাবে মরজীব আমরা সতত মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। কিন্তু এখন বিনোদিনী আর তাহা নহে, এখন ত সে আর হিন্দুর পবিত্রতম আঁধার গৃহে উজ্জলতম মাণিকরূপে বিরাজিত নাই; এখন আর সে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচারিণী বলিয়া—ধর্ম্মকর্ম্মের মূর্ত্তিমতী আদর্শ প্রতিমা বলিয়া হিন্দুসংসার পবিত্র করে না, কাজেই সে এখন নরকের কীট হইতেও অপবিত্র; তাহার আচার ব্যবহার সাতিশয় ঘৃণীত, অপরাপর কার্য্যও যারপর নাই গর্হিত, দেখিলে—মনুষ্যোচিত বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মন্দ, মন্দ হইলে বরং তাহাতে কিছু ভাল জিনিষ পাওয়া যায়, কিন্তু ভাল, মন্দ হইলে তাহার আর কিছুই থাকে না—একেবারে অব্যবহার্য্য—অসারত্বের চরম সীমায় আসিয়া পৌছায়। রসনাতৃপ্তিকর পরমান্ন রন্ধনের দোষ হইলে গলাধকরণ করা যায় না, গলিত মৎস্য বরং উদরস্থ করা যাইতে পারে।

বিনোদিনী যখন গৃহে ছিল, পবিত্র ভাবে হিন্দুর সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিত, তখন সে দেবী ছিল। এখন গৃহের গণ্ডী পার হইয়া—পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্খলিত হইয়া সে পিশাচিনী হইয়াছে—তাহার এখনকার আচার ব্যবহার কঠিনতম না হইবে কেন, মূর্ত্তিই বা ভয়ঙ্কর উগ্র, বিভীষিকাময়ী না হইবে কেন? চুণীর অনুপস্থিতিকালে সে একজন নূতন খ্রীষ্টানধর্ম্মাবলম্বী যুবককে আপনার প্রণয়পাত্র স্থির করিয়া চুণীর প্রণয়ে জলাঞ্জলি দিয়াছে; সে এখন আর চুণীকে চায় না—নূতনে মজিলে কে কবে পুরাতনে স্পৃহা করে?

চুণীলাল প্রমাদ গণিল, যাহার জন্য সে এত করিয়াছে, এরূপ পাপপঙ্কে আপন ভুলিয়া নিমজ্জিত হইয়াছে—সে তাহাকে ত্যাগ করিল? অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেও তাহার আবেদন আর তথায় গ্রাহ্য হইল না। চুণীর বিষম আক্রোশ পড়িল—শান্তিরামের উপর। শান্তিও চুণীর প্রতি পূর্ব্ব হইতেই আক্রোশবদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে দুইজনে বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। প্রচারকার্য্যে চুণীলালের একটু-একটু অমনোযোগ প্রকাশ পাইতে লাগিল। জ্যাডকিল সাহেব এতদিন চুণীকে খুব ভালবাসিতেন, তাহার খুব প্রশংসা করিতেন। এখন শান্তিরাম প্রচারকার্য্যে চুণী অপেক্ষাও খুব দক্ষ হওয়ায়, খ্রীষ্টানধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া অনেক লোককে এ ধর্ম্মে টানিয়া আনায়—চুণীর প্রতি সাহেবের প্রীতি কমিয়া গেল। দেখিয়া শুনিয়া চুণী প্রচারকার্য্যে জলাঞ্জলি দিল, কিন্তু জীবিকানির্ব্বাহের একটা উপায় ত করিতে হইবে; আর বেশী টাকা উপার্জ্জনে সক্ষম দেখাইয়া পুনরায় ত বিনোদিনীকে হস্তগত করিতে হইবে। সে যখন কুলে কালী দিয়াছে—তখন সে ভোগ-বিলাস প্রচুর পরিমাণে লাভ করিতে চায়—অর্থ বেশী না হইলে এ সকল বিষয় সহজসাধ্য হইবার নহে। অতএব বেশী অর্থ উপার্জ্জনের মন্তব্য করিয়া, সে চা-বাগানে কুলী চালানী কাজে প্রবৃত্ত হইল। তখনকার সময়ে অর্থ উপার্জ্জনের সুগম পন্থা ইহা অপেক্ষা আর কিছু ছিল না। ছলে-বলে লোক সংগ্রহ করিয়া পাপের পথ প্রশস্ত করিতে ইহাও তখনকার

সময়ে একটা সহজ উপায় মধ্যে পরিগণিত ছিল। চুণী সামান্য পাপকার্য্য ছাড়িয়া, তাহার তুলনায় এইবার ঘোর পাপে মজিতে ছুটিল—এইজন্য বলিতে হয়—পাপকাজ একবার করিতে আরম্ভ করিলে, তুষের আগুণের মত দেহ-গেহকে পুড়াইয়া খাক্ না করিয়া ছাড়ে না। চুণী গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে আসিল কিন্তু শান্তিরামের সহিত তাহার মনোমালিন্য ঘুচিল না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—সে সময় খ্রীষ্টানধর্ম্মের প্রচারকার্য্য দেশে খুব খরতর স্রোতে চলিতেছে; হিন্দুধর্ম্ম একপ্রকার লোপ পাইতে বসিয়াছে; সমাজে যথেচ্ছাচার আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্মের যখন গ্লানি উপস্থিত হয়—সাধারণের প্রাণে যখন ধর্ম্মনষ্টের কষ্ট আরম্ভ হয়—ধার্ম্মিকের মান-সম্ভ্রমের লাঘব হইতে থাকে, ভক্তবৎসল ভগবান ধর্ম্ম এবং সাধু-সজ্জনগণের রক্ষার্থে তখন একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন। দেশ হইতেই একজন না একজন মহাত্মা উদ্ভাসিত হইয়া সে সময় ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের মান রক্ষা করেন। এই দারুণ দুঃসময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করিয়া দেশকে খ্রীষ্টানধর্ম্মের কবল হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণভাবে সেই সময় এই নূতন ধর্ম্ম প্রচার না করিলে বোধ হয়—হিন্দুর নাম পর্য্যন্ত থাকিত না। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম ছাড়া নহে। পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা রামমোহন বুঝিয়াই ইহা প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা যে অতি-উচ্চস্তরের লোকের জন্য বেদে ব্যবস্থিত হইয়াছে—ইহা যে সাধনার চরম ফল—যার তার

পক্ষে নহে—তাহা তিনি তখন বুঝিবার সময় পান নাই। লোকে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আর কর্ম্মকাণ্ডে তত মনোনিবেশ করিতে চাহে না, ফুল-বিল্বপত্র, কোশাকুশী লইয়া ধর্ম্ম করিতে লোকের আর তত আস্থা নাই; ইহা অতি কুসংস্কার—এইজন্য খ্রীষ্টানদের নবপ্রচারিত ধর্ম্মে লোকে এত আগ্রহান্বিত হইতেছে দেখিয়া তিনি দেশকাল পাত্রের রুচি অনুসারে বৈদিকধর্ম্মের চরম ব্রহ্মজ্ঞান—যাহাতে বাহ্যিক কোন পূজাদি করিতে হইবে না—এমন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ধর্ম্মবিপ্লবের প্রবল স্রোতে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইহার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলিলেও এবং হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সাধারণজনগণের ধর্ম্মশিক্ষার অন্তরায় হইলেও একসময়ে ইহার দ্বারা যে দেশের পরমোপকার সাধিত হইয়াছিল—তাহাতে আর কাহার মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

দেশে ধর্ম্মের স্রোত আবার ভিন্নভাব অবলম্বন করিল। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি রাজা রামমোহন প্রচারিত ধর্ম্মে আস্থাবান হইয়া, খ্রীষ্টানধর্ম্মে অবজ্ঞা প্রদর্শন করতঃ ইহার শীতল ছায়ামূলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। হিন্দু সকল ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু অন্যধর্ম্মীর হিন্দুধর্ম্মে আশ্রয় গ্রহণ করা অসম্ভব—অদ্যাবধি কেহ প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই; ইহার বিধি-নিষেধ, ইহার নিয়ম-প্রণালী এত কঠিন; ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম তাহা নহে—খ্রীষ্টানধর্ম্মের মত উদার প্রকৃতিসম্পন্ন—তুমি যে কেহ হও, যে কোন জাতির অন্তর্ভূক্ত হও না কেন; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের কোল চিরবিস্তৃত—আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলে কেহ বাধা দিবার নাই।

কাজেই অনেক খ্রীষ্টান আবার এই নূতন প্রকারে গঠিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

চুণীলাল কিন্তু কোন ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করিল না। না হিন্দু, না মুসলমান, না খ্রীষ্টান, একটা খিচুড়ী পাকাইয়া গুণ্ডামী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এক্ষণে যে কার্য্য সে গ্রহণ করিয়াছে—তাহা প্রকৃত গুণ্ডামী ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? যে কার্য্য করিয়া দেশবাসীর সর্ব্বনাশ করিতে হইবে; স্ত্রী-পুরুষের, যুবক-যুবতীর অভিসম্পাৎ শির পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—পেটের দায়ে, মানসম্ভ্রমের জন্য অর্থের লোভে, এমন সর্ব্বনাশ করা অপেক্ষা পেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া, দুর্ব্বিসহ অর্থলোভ চিরতরে পরিবর্জ্জন করিয়া দৈন্যের অতলতলে ডুবিয়া যাওয়া এবং মানসম্ভ্রমের গোড়ায় ছাই নিক্ষেপ করা কি খুব স্পৃহনীয় বস্তু নহে?

চুণী উদ্দামপ্রকৃতির বশে নবোদ্দমে কুলী সংগ্রহ কার্য্য চালাইতে লাগিল। প্রথম-প্রথম দুইএকটী কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়া কিছু উপার্জ্জনে সে-আশায় উৎফুল্ল হইল কিন্তু তাহার পরেই একস্থানে কয়েকজনকে প্রলোভনে ভুলাইতে গিয়া, এমন প্রহার খাইল যে সে যাত্রা কোন গতিকে দুইমাস শয্যাগত থাকিয়া বহুকষ্টে রক্ষা পাইল বটে; তথাপি অর্থের লালসা সমভাবেই বলবতী রহিল—ইহার দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সে শান্তিরামকে জব্দ করিবে—বিনোদিনীকে হস্তগত করিবে। কিন্তু ইতিপুর্ব্বে শান্তিরামের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া চুণীকে রাজদ্বারে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইতে হইত, যদি সে যাত্রা পান্নালাল স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিয় যদুপতির দ্বারা

তাহার মোকদ্দমার তদ্বির না করিতেন। সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়া চুণীর সেই অবধি ভ্রাতার সহিত আর দেখা করিবার আবশ্যক হয় নাই। কারণ নূতন ব্যবসায়ে সে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিল, সম্প্রতি প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া সমস্ত অর্থ ফুরাইয়া গিয়াছে! সে আড়কাটী বলিয়া সকলে জানিতে পারায়, ব্যবসার ক্ষেত্রও আর তত সুগম নহে। এখন সে আবার কাহাকে করতলগত করিবে—আজ দুইদিন অনবরত তাহার চিন্তায় অস্থির; এইবার কোন আত্মীয়ের বাটীতে গিয়া কলে-কৌশলে শীকার হস্তগত করিতে হইবে—তাহা হইলে কেহ সহজে সন্দেহ করিতে পারিবে না। কিন্তু যায় কোথা—করে কি?

দুইদিন অনবরত চিন্তার পর চুণী যে শীকার করিবার মন্তব্য করিয়াছে—হে ভগবান—তাহার এ শীকার হস্তচ্যুত করিয়া দাও, তাহার মস্তকে তোমার দারুণ অশণি নিক্ষেপ করিয়া, চিরতরে এ পাপ অভিনয়ের যবনিকাপাত করিয়া ফেল। পাপিষ্ঠ এ পাপইষ্ট সিদ্ধি করিয়া জগতে আর যেন অধর্ম্মের স্রোত বাড়াইতে না পারে। তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা, ত্রিজগতের একমাত্র কর্ত্তা, এ পাপকার্য্যের অবসান করিয়া দাও, পাপের প্রতিফল হাতে-হাতে প্রদান কর—পাপীষ্ঠের নাম চিরতরে জগত হইতে মুছিয়া যাক্।

চুণী ধীরে-ধীরে সন্ধান লইল—যে বরাহনগরের বাটীতে বগলাচরণ নাই—কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি স্থানান্তরে গিয়াছেন; তাহার দাদাও গুরুমন্ত্র লইবার জন্য ব্যস্ত; নিতাইকে

গুরুদেবের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া, তিনি মাতুলালয়ে আছেন। কিছুদিন হইল, প্রভুর দুরবস্থা দেখিয়া নিতাই আবার আসিয়া যুটিয়াছে। তাহার ত দেশে কেহ নাই—তবে আর প্রভুর সেবায়, ব্রাহ্মণের সেবায় শেষ দশায় বিরত থাকে কেন—এই মনে করিয়া সে পান্নালালের আশ্রয়েই আসিয়াছে—দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা হওয়ায় পান্নালাল তাহাকে কালীবাড়ীতে গুরুর অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু দেখা না পাওয়ায় তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। হায়! তখন পাইয়া কেন ছাড়িয়া দিলাম—আর কি সে মহাপুরুষের দেখা পাইব ইত্যাদি চিন্তায় রজনী অনেক হইয়া গেল; বরাহনগরের বাটী যে পুরুষশূন্য—বগলাচরণ পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া যাইলেও সে কথা তাঁহার মনে নাই। চিন্তা এমনি সর্ব্বনাশকারী বটে।

বরাহনগরের বাটীতে পুরুষ মানুষ কেহ নাই জানিতে পারিয়া চুনী সেই গভীর রজনীযোগেই শীকার অন্বেষণে বাহির হইল।

বর্ষাকাল—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—একবার-একবার কৃষ্ণবর্ণা কামিনীর দন্তবিকাশের মত বিদ্যুৎ হানিতেছে। তখন কলিকাতা এত আলোকমালায় সজ্জিত হয় নাই। যাতায়াতের এত যানবাহন ছিল না, আবশ্যকমত পাল্কী বা ডুলী ব্যবহার হইত। রাত্রি অনেক হইয়াছে; ভানুমতি নিজ পুত্র ও শিবানীর পুত্র দুইটীকে লইয়া গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন, শিবানী তখনও প্রত্যূষে রন্ধনের কাষ্ট কর্ত্তন করিতেছেন, আজ পতির আসিবার স্থির নিশ্চয় ছিল, এখনও

আসিলেন না কেন, তবে কি কোন অসুখ হইল—ইত্যাদি চিন্তা করিয়া এবং তাঁহার উপস্থিত অবস্থা পরিবর্ত্তনে মতিভ্রংশের বিষয় অনুভব করিয়া তিনি বিষাদিতচিত্তে কাজ করিতেছিলেন।

এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—বৌ-দি! পরিচিত কণ্ঠস্বর বুঝিয়া শিবানী দরজা খুলিয়া দিলেন—সম্মুখে চুনীলালকে পাল্‌কীসহ উপস্থিত হইতে দেখিয়া বলিলেন—"ঠাকুর-পো! পাল্‌কী কেন, তিনি কেমন আছেন?"

চুনী কাঁদিয়া ফেলিল—বলিল—"বৌ-দি! দাদার অবস্থা ভাল নহে, যদি শেষ দেখা দেখিতে চাও ত শীঘ্র চল। আমি কাল সংবাদ পাইয়া আসিয়াছি, এবং নানাপ্রকার চিকিৎসা করাইয়াছি—কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় নাই। খোকাদের এ সময় লইয়া যাইবার দরকার নাই, কারণ সেখানে অত্যন্ত স্থানাভাব। তিনি একটু ভাল হইলেই তুমি চলিয়া আসিবে। নিতাই আসিতেছে—সে ইহাদের তত্ত্বাবধারণ করিবে। কথা শুনিয়াই সতীর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন, ভানুমতী জাগিয়া বাহিরে আসিয়া সমস্ত শুনিল এবং সেও চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিল না। চুনী বলিল—বৌ-দি! এরূপ করিয়া কান্নায় সময় অতিবাহিত করিলে চলিবে না। শীঘ্র চল। জগতের কোন মায়া-মমতা কি আর তখন শিবানীকে বাধা দিতে পারে? তাঁহার প্রাণ হইতে প্রিয়তম বস্তু পীড়িত—যাহাকে লইয়া তাঁহার এ জগতের সহিত সম্বন্ধ, তিনি যখন পীড়িত, অচৈতন্য, তখন এ জগতে আর কার মায়া বেশী হইতে পারে? শিবানী

অগ্র-পশ্চাৎ কিছু বিবেচনা করিলেন না; দেবরের কথায় বিশ্বাস করিয়া শিবিকারোহণ করিলেন—যাইবার সময় কেবল বলিয়া গেলেন—"বউ! নিতাই আসিতেছে, কিছু ভয় করিও না, যদি গিয়া দেবতার দেখা পাই, যদি তাঁহাকে ভাল করিয়া আসিতে পারি—তবেই আসিব—নতুবা এই শেষ দেখা। সতী পুত্র-কন্যার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না—পাল্কীবাহকগণ কাঁদে করিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিল, চুণী শিবিকার সহিত চলিতে লাগিল। হায়, ভগবান! পাষণ্ড এখনও সতীকে লইয়া বাটী হইতে বহুদুর যায় নাই, এই ত সময়—কোথায় তোমার অস্ত্রশস্ত্র—কোথায় তোমার এক পুরুষঘাতিনী শক্তি, যাহা দানব-সংহারে সতত নিক্ষিপ্ত হইত? আজ এ দানব অপেক্ষা মহাশক্র, পৃথিবীর দুর্দ্দান্ত পাপী আজ একটী সতী-সিমন্তিনী, বঙ্গ-ললনার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। ফেল, ফেল বিশ্বেশ্বর, পাষণ্ডের মস্তকে তোমার অমোঘ বজ্র, সতীর সহিত এ বিশ্বের প্রাণ-মান রক্ষা কর।

শিবাণী পথঘাট কিছুই জানেন না, হিন্দুর গৃহলক্ষ্মী, চিরকাল গৃহে আবদ্ধ, রাস্তাঘাটের অনুসন্ধানে তাহার আবশ্যক কি? প্রাণের দেবর ত সঙ্গে আছে—এই বিশ্বাসে তিনি পতিপ্রাণ ভিক্ষার্থে তদগতচিত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, সরল-বিশ্বাসিনী সতী জানেন না যে, পতির পীড়ার অছিলায় আজ তিনি কোন ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইতে যাইতেছেন।

শিবিকা গঙ্গাতীর অতিবাহিত করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিল। আকাশ ঘোর ঘন-ঘটাচ্ছন্ন, চারিদিকে তমস্বিনীর

তমস রাজত্ব বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান, শিবিকা সেই দারুণ অন্ধকার ভেদ করিয়া যাইতেছে, কোথাও জন-মানবের সমাগম নাই। কিছুক্ষণ পরে শিবিকা আসিয়া, তীরস্থিত একখানি ক্ষুদ্র অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইল, চুণীলাল সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া কাহার সহিত কি বলাবলি করিল, তারপর শিবরাণীকে শিবিকা হইতে নামিতে বলিল। শিবরাণী অবগুণ্ঠন দিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই গৃহের আলোকে চারিদিক বেশ দেখা যাইতেছে, সম্মুখে বিস্তৃত বাঁধাঘাট, তরঙ্গিনীর তরঙ্গ ঘাটে আসিয়া ঘাত-প্রতিঘাত হইয়া বায়ুসহযোগে এক ভীষণ শব্দ উত্থিত করিতেছে। ঘাটের উপরেই একখানি বিস্তৃত বোট সুসজ্জিত, অনেক স্ত্রীপুরুষ তাহাতে কলরব করিতেছে। তীরে আর কোন লোকজন নাই। চুণীলাল আসিয়া বলিল—বউ-দি! চল নৌকায় উঠিবে। শিবরাণী দেখিলেন—এত পারাপারের নৌকা নয়। এ যে বৃহৎ জাহাজ কোন দূরদেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। তিনি স্বামীর মুখে শুনিয়াছিলেন—শিবপুর যাইতে হইলে একস্থানে কেবল ছোট-ছোট নৌকায় পার হইতে হয়। তবে এ কোথায়—চুণী আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—ঠাকুরপো! তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, শিবপুরে যাইতে হইলে, ছোট নৌকায় পরপারে যাইতে হয়, তাহাতে দেশীয় মাঝী-মাল্লারাই কাজ করে; এ যে বড় জাহাজ, বিজাতীয় ব্যক্তিগণ উহা চালনা করিতেছে। আমি উহাতে উঠিব কেন? চুণী নানাপ্রকার মিথ্যাকথা কহিয়া, তাহা পরপারেই লইয়া যাইবে বলিয়া

বুঝাইতে লাগিল। শিবাণীর মন কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না। তিনি কোন মতে উঠিতে চাহিলেন না। এদিকে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, দারুণ করকাসহ বৃষ্টি হওয়ায়, সকলে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিল, জাহাজ হইতে যে আলোটুকু আসিতেছিল, চারিদিক আবদ্ধ হওয়ায় তাহাও আর আসিল না। দারুণ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া চুণী প্রথমে অনেক বিনয় সহকারে বলিল—বউ-দি! বড় দেরী হইতেছে, দাদার পীড়া অত্যন্ত শক্ত, বোধ হয় তাঁহার সহিত দেখা হইবে না, তুমি শীঘ্র চল। শিবাণীর সন্দেহ হইয়াছে; তারপর তিনি চুণীর প্রতি যে সরল বিশ্বাসটুকু বদ্ধমূল করিয়া বাটীর বাহির হইয়াছিলেন, এখানে আসিয়া এই সজ্জিত জাহাজে নানাপ্রকার লোকজন দেখিয়া, তাঁহার সে বিশ্বাস তিরোহিত হইয়াছে। কাজেই জাহাজে উঠিবার ইচ্ছা তাঁহার একেবারেই নাই, পাষণ্ড চুণীর স্বভাব-চরিত্রের কথা এখন তাঁহার বেশ মনে পড়িতেছে, তাহার কথা যে সমস্ত মিথ্যা, ছলে-বলে, কৌশলে সে, যে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে আনিয়াছে, তাহা তিনি এখন বেশ বুঝিতে পারিলেন। এই সময় চুণী সম্মুখবর্ত্তী অফিস হইতে অনেকগুলি টাকা লইয়া কাপড়ে বাঁধিতে লাগিল দেখিয়া, তাঁহার সন্দেহ আরও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

শিবাণী আর কিছুতেই অগ্রসর হন না দেখিয়া, চুণী হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। এইবার শিবাণীর আসন্ন বিপদের বিষয় বুঝিতে আর বাকী রহিল না। তিনি আর্ত্ত-স্বরে বলিলেন—দেবর! একি এ, নিজের কুলকামিনীকে পরহস্তে

ডালিয়া দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলে—এ অর্থে কতদিন চলিবে ঠাকুর পো ? নিষ্কলঙ্ক সাধকের বংশে ত আজীবন কালী মাখাইয়া আসিতেছ, তারপর আবার পশুর মত আচরণে সে পবিত্র-বংশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে কিছুমাত্র ভয় পাইতেছ না। পাষণ্ড! মনে করিয়াছ কি উপরে ভগবান নাই ? পাপ কি এইরূপ অবাধে করিয়া চির-দিনই নিষ্কৃতি পাইবে ? এখনও সাবধান হও, নিজের কুলকামিনীর অপমান করিয়া পিতৃ-পিতামহের প্রাতঃস্মরণীয় নাম লোপ করিও না। কিন্তু কথা শুনে কে, চুণী কি নিজে এ সমস্ত কাজ করিতেছে, দুষ্টবুদ্ধি, পাপ সরস্বতী যে তাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া এ মহাপাপে লিপ্ত করিতেছে, সে যে যন্ত্রচালিত, তাহাকে যে করিতেই হইবে। চুণী কথা শুনিল না—অধিক রাত্রি হইতেছে, তাহার উপর বৃষ্টিপাত অসহ্য হইল,—চুণী আর দাঁড়াইতে পারিল না। নিজবংশের লক্ষ্মীস্বরূপিণী জননী-সমা বধুকে ভীষণবেগে টানিয়া লইয়া জাহাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সে ভীষণকায় দুর্ব্বৃত্তের সহিত বলে ক্ষীণাপ্রাণা হরিণীর ন্যায় দুর্ব্বলা শিবরাণী পারিয়া উঠিবেন কেন। তিনি পরিত্রাহী রবে চীৎকার করিতে লাগিলেন। মধুসূদন "রক্ষা কর, এ বিপদে আর আমার কেউ নাই নারায়ণ, বলিয়া যখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন সতীর সহায়, ধার্ম্মিকের রক্ষাকর্ত্তা ভগবান কি আর থাকিতে পারেন। অন্ধকারে ভীষণ কর্কশ-কণ্ঠে শব্দ হইল—পাষণ্ড! আজ তোর শেষদিন, বলিয়া একটী অলক্ষিত ভীষণ হস্তের ততোধিক ভীষণ দণ্ডাঘাত চুণীর হস্ত লক্ষ্য করিয়া পতিত হইল, তাহার উপর আর এক ঘা লাটী তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া

ভীমবেগে পড়িল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তাহা স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিল। চুণী "বাপ্‌রে বলিয়া সাঁকোর উপর হইতে জলে পড়িয়া গেল। শিবরাণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন। পিতা যেমন কন্যাকে, অথবা পুত্র যেমন রুগ্ন মাতাকে অতি-শশব্যস্তে ও সন্তর্পণে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়—আগন্তুক শিবরাণীর অচৈতন্য দেহ সেইরূপ স্কন্ধে করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল কিন্তু অচৈতন্ত অবস্থায় বেশীদূর লইয়া যাইতে তাহার সাহস হইল না। নিকটবর্ত্তী বৃক্ষতলে তাঁহাকে নামাইয়া মুখে জলসেক করিতে লাগিল। বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়াছে; আগন্তুক ঘাটের মাঝীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ভাই! তোমরা দয়া করিয়া আমাকে একটা আলো প্রদান কর, আমি পীড়িতা মাতাকে বাটী লইয়া যাইতেছি, তিনি বৃষ্টিতে ভিজিয়া অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শুনিবামাত্র একজন বৃদ্ধ একটী আলোকাধার ও কতকগুলি কাষ্ঠ আনিয়া দিল। আগন্তুক তাহা প্রজ্বলিত করিয়া দেহ উত্তপ্ত করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শিবরাণীর চৈতন্য হইল, দেখিলেন—একটী বৃক্ষতলে তিনি শায়িতা, সম্মুখে পুত্রতুল্য, প্রিয়ভৃত্য নিতাই। পরবর্ত্তী ঘটনার ভীষণ স্মৃতি স্বপ্ন-রেখাবৎ তখন শিবরাণীর হৃদয়ফলকে অঙ্কিত ছিল। ধর্ম্মহানীর ভয়ে ও অপমানে তখন প্রাণটা যেন হৃৎপিণ্ডের মধ্যে আকুলি-বিকুলী করিতেছিল, কিন্তু সে ত চুণী, তবে নিতাই কোথা হইতে আসিল? তিনি বিষম ভীতি-বিহ্বল বিকম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—নিতাই! এ কাহার কাজ বাবা?

নিতাই দরবিগলিত-ধারে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল,—মা! চিরকাল যাহার দ্বারা হয়—এ সেই মধুসূদনেরই কাজ। বিপদে তিনি ভিন্ন আর কে রক্ষা করিতে পারে? মা! এ জগতে সতীর অপমান করিয়া কে কবে অক্ষত শরীরে নিরাপদে ফিরিয়াছে। জগতে এমন একটী ঘটনার প্রমাণও কি কেহ দিতে পারে? বিশ্বধাত্রী ভগবতী যাঁহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার বিপদ কোথায়? আপনি একটু সুস্থ হইয়াছেন ত, তাহা হইলে একখানি পাল্কীর অনুসন্ধান করি।

শিবানী। বাবা! পাপিষ্ঠ চুণীর যে এমন মতিচ্ছন্ন হইয়াছে—তাহা জানিতাম না, তাই দেবর বলিয়া সরলবিশ্বাস করিয়াছিলাম, আহা! মা তাহাকে সুমতি দিন। নিতাই তুমি এ সংবাদ কোথায় পাইলে?

নিতাই। মা! অনেক রাত্রিতে বড় বাবু বলিলেন—নিতাই! আমার মনে ছিল না, বগলা বাড়ী হইতে স্থানান্তরে গিয়াছে, সেখানে দুইটীমাত্র স্ত্রীলোক, তাহাদের রক্ষার জন্য এখনি যাইতে হইবে, শুনিয়া আমি লাটীর উপর ভর করিয়া একঘণ্টায় বরাহনগরে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া বগলাবাবুর স্ত্রীর মুখে শুনিলাম যে বাবুর পীড়ার কথা বলিয়া চুণী তোমাকে লইয়া গিয়াছে। পাষণ্ডের ছলনা শুনিয়া আমার দারুণ সন্দেহ হইল। বধূমাতাকে "বাবু নিরাপদে আছেন তাঁহার কোন অসুখ নাই।" বলিয়া আশ্বস্ত করিলাম, তখন আপনার জন্য তিনি কাঁদিয়া আকুল হইয়া বলিলেন—"চুণী নিশ্চয়ই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবে—

নিতাই তুমি দেখ।" আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, আপনাদের আগমন পথ জানিয়া একেবারে ঘাটে আসিয়াছি। চুণী যে এইরূপ লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, কুলী-চালানী কাজ করিয়া সে, যে সরলপ্রাণ গৃহস্থের প্রাণে দাগা দিতেছে, এবং তাহার জন্য অনেক স্থানে সে, যে ভীষণ প্রহার খাইয়াছে, তাহাও শুনিয়াছি, এবারের প্রহারও বড় কম হয় নাই।

শিবানী কাঁপিতে-কাঁপিতে বলিলেন,—সে কিরে বাবা! কিরূপ মেরেছিস্, প্রাণের ত কোন হানী হইবে না?

পাঠক! ধার্ম্মিকের প্রাণের তেজ, তাঁহার আত্মনির্ভরতা কত দৃঢ় দেখিলেন কি? চুণী তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, দারুণ বিপদে ফেলিয়া প্রাণে মারিতেছিল, তথাপি তাহার প্রতি কিছুমাত্র কোপ প্রকাশ নাই। সরল-হৃদয়ে মায়ের কাছে তাহার সুমতির জন্য প্রার্থনা এবং প্রাণের কোন হানী না হয়, তজ্জন্য নিতাইয়ের প্রতি অনুরোধ। প্রাণ ধর্ম্মে বলে সুদৃঢ় না হইলে, কি এমন সরলতা ও কোমলতার আশ্রয়-স্থল হইতে পারে? যে হৃদয়ে দেবতার আসন সতত বিস্তৃত, স্বর্গীয় সম্পদ সকল তাহাতে পরিবেষ্টিত থাকিবে না কেন?

শিবানী স্বামীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, নিতাই বলিল—মা! তাঁহার কোন অসুখ করে নাই। তিনি খুব কুশলে আছেন, তবে অবস্থাটা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে, ইহার জন্য একটা শান্তিস্বস্ত্যয়ন করা উচিত এবং দীক্ষাটী লওয়া কর্ত্তব্য, এইজন্য গুরু-দেবের জন্য তিনি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। নতুবা তিনি আজই

কলিকাতায় আসিতেন। স্বামীর কুশল সংবাদ শুনিয়া জগৎস্বামীর পদে সতী কোটী-কোটী প্রাণাম করিলেন।

বাটীতে কয়েকটী শিশু আর ভানুমতী একাকিনী রহিয়াছে। শিবানী আর কালবিলম্ব না করিয়া নিতাইকে পাল্কী আনিতে বলিলেন। রজনী প্রভাতের পূর্ব্বে তাঁহারা বাটী পৌছিলেন। ভানুমতী আকস্মিক বিপদে যেন দিশাহারা হইয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে ননদিনীকে অক্ষত শরীরে পাইয়া নিতাইকে শত-শত ধন্যবাদ দিলেন। পুত্র ও কন্যাটীকে জাগরিত করিয়া যখন জননীর ক্রোড় আলোকিত করিয়া দিলেন; তখন পূর্ব্বগগণে বালসূর্য্যের লোহিত-কিরণ বিস্তারিত হইয়াছে।

প্রভাতে বগলাচরণ বাটীতে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। চুণীর ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া, তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। জগতে মহামায়ার লীলাখেলা কাহার দ্বারা কখন কিরূপে যে অভিনীত হয়, তাহা চিন্তা করিলে বাস্তবিক আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতে হয়—সে চিন্তার কোন কুল-কিনারা না পাইয়া যেন স্বতঃই বলিতে হয়—"মায়া! কি খেলা খেলিছ ভব-অঙ্গনে।" এক ভাই আদর্শ মহাপুরুষ, আর একজন নরকের কীট। তাই বলি—"কার ভাগ্যে কি লেখা, লিখেছ হে সখা, না যায় চক্ষে দেখা, বুঝে উঠা দায়।" আহারাদির পর বগলাচরণ গৃহে আসিয়াছেন, দেখিয়া নিতাই প্রভু-পত্নীর অনুমতি গ্রহণানন্তর সেইদিনই শিবপুরে ফিরিয়া আসিল।

নবম পরিচ্ছেদ

দীক্ষা

ভগবানে যাহার প্রাণ সমর্পিত হইয়াছে, যে একাগ্রভাবে তাঁহাকেই জাগতিক সমস্ত কাজ-কর্ম্মের একমাত্র নিয়ন্তা বলিয়া জানিয়াছে+ সে জগতের সুখে একেবারে আত্মহারা হয় না এবং দুঃখেও একেবারে অধীর হইয়া পড়ে না।

নিতাই আসিয়া যখন চুণীলাল সংক্রান্ত দারুণ দুর্ঘটনার কথা পান্নালালকে নিবেদন করিল, তখন তাঁহার অন্তরে বিষাদভাব কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হইল না। শিবানীর ন্যায় সতী স্ত্রীর কেহ অনিষ্ট করিতে পারে না, সে বিপদে পতিত হইলে, ভগবান তাহাকে যে কোন প্রকারে হউক রক্ষা করিবেন। সতীর রক্ষাকর্ত্রী শিবসিমন্তিনী যে তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরিতেছেন। শিবানী বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছে, নিতাই তাহাকে পাপিষ্ঠের করাল-গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়াছে, ইহাতে তিনি কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না, তবে ভগবানের দৌত্যকার্য্যে সে, যে কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে ভগবানের প্রিয়পাত্র বলিয়াই জানিলেন। কিন্তু মানুষ হইয়া চুণীর যে এরূপ পশুর মত অধঃপতন হইয়াছে, তাহা শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন, পরে বলিলেন—"চুণী কোথা গেল নিতাই?"

নিতাই পান্নালালের মহত্বের বিষয় উপলব্ধি করিল, সে ছোটলোক হইলেও বহুদিন মহতের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া, মহতের চরিত্র অনুশীলন করিয়া, সেও মহত্বলাভ করিয়াছিল; আজ যাহা দেখিল তাহাতে সেও স্তম্ভিত হইয়া বলিল—"প্রভু! অন্ধকারে কোথায় গেলেন, তাহা জানি না—তবে তাঁহার সহিত আমাকেও দস্যুবৃত্তি করিতে হইয়াছিল, নতুবা মাকে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিতাম না।"

পান্নালাল। দস্যুর সহিত দস্যুবৃত্তি না করিলে, সাধুতায় কবে স্বকার্য্য সাধন হইয়াছে? তবে যেখানে হইয়াছে—সেখানে সাধুত্বের উন্মেষ কিছু না কিছু থাকেই।

নিতাই। আপনাকে আজকালের মধ্যে একবার বাড়ী যাইতে হইবে, কারণ আপনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত এইরূপ ঘোষণা করিয়া চুণী মাকে আপনার নিকট লইয়া আসিবার ভাণে চা-বাগানে চালান দিতে আনিয়াছিল।

পান্নালাল। আচ্ছা বাবা! আমি শীঘ্র যাইব। তুমি আজ পূজার আয়োজন ভাল করিয়া কর, আমি গঙ্গাস্নান করিয়া আসি।

সদানন্দময় পুরুষ ভাগিরথী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এত বড় একটা বিপদ যে মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল, তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই। হৃদয়ে কিছুমাত্র রাগের উত্তেজনা হইল না—সমস্তই সেই **মায়ার খেলা** ভাবিয়া হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয় করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়বিশ্বাস **মহামায়া** ভক্তকে সকলপ্রকার পরীক্ষায়

ফেলিয়া পরীক্ষিত করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মচ্যুত বা ধর্ম্মহীন করিতে পারেন না।

পান্নালালের এখন ঐকান্তিক ইচ্ছা গুরুদেবের দর্শনলাভ করিয়া দীক্ষিত হওয়া, সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও কলিতে নাকি তান্ত্রিক দীক্ষা একান্ত আবশ্যক, তাই গুরুদেবের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিতেছে, মন অত্যন্ত উচাটন হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার দেখা পাওয়া যায় কোথা, এই চিন্তাই এখন তাঁহার মনে সদা সর্ব্বদা উদয় হইয়া, সংসারিক অন্য চিন্তা নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

যে বিষয় যত চিন্তা করা যায়, সে বিষয়ের সাফল্য তত সত্বর সাধিত হয় বিশেষতঃ চিন্তায় তন্ময় হইতে পারিলে চিন্তামণি লাভের আর চিন্তা থাকে না? মনে-প্রাণে ডাকিলে যখন ভগবান লাভ হয়, হৃদয়ে গভীর চিন্তা করিলে যখন বহুদূরস্থিত ব্যক্তির হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারা যায়, তখন শ্রীগুরু ভগবানের দর্শনলাভ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে কেন?

আজ অতি শুভদিন; পঞ্জিকা আজিকার তিথিকে দীক্ষা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে স্থিরীকৃত করিয়াছেন। হায়! আজ যদি প্রভুর দেখা পাইতাম। তাহা হইলে কতই শুভ হইত। **পান্নালাল** স্নান করিয়া তীরে উঠিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতে-করিতে ভাগিরথীর তটসন্নিকটবর্ত্তী বৃক্ষতলে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এঁ্যা একি, এই যে আমার প্রাণের ধন, এই যে আমার ইষ্টদেব **অবধূত ঠাকুর**। মরি, মরি, বিনায়াসে যে আজ হৃদয়ের ধন করতলগত হইল। **পান্নালাল** আর থাকিতে

পারিলেন না—শশব্যস্তে তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

অবধূত বহুদিনের পর আবার লোকালয়ে আসিয়াছেন। **পান্নালালের** হৃদয়ের আকর্ষণই এ আগমনের কারণ। ভক্ত ডাকিলে ভগবানের আসন এইরূপেই টলিয়া থাকে।

সিদ্ধপুরুষ ঠিকস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। **পান্না-লাল** যে এখন এ অঞ্চলে অবস্থান করিতেছেন—তাহা তিনি দেখিয়া জান নাই। অথচ ঠিকস্থানেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যোগবলে ঋষিগণ কত অমানুষিক কাণ্ড করিয়া গিয়াছেন, যাহা আমরা এখন নয়নের সম্মুখে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতেছি। সাধনবলে অসাধ্য সাধন হইতে পারে—যোগনিরত **অবধূতের** পক্ষে এ সামান্য জ্ঞান বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অবধূত বলিলেন—বাবা। "তুমি বহুদিন আমাকে স্মরণ করিয়াছ কিন্তু ঠিকসময় না হইলে ত আসিতে পারি না, তাই আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে। তোমার অবস্থাবিপর্য্যয়—**চুণীর** ঘোর-অধঃপতন সমস্তই জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু চন্দ্র রাহুমুক্ত হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। দীক্ষাগ্রহণের পর মাতৃশক্তি তোমার প্রতি ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হইবে। তুমি নানা কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ—অতএব **দেবী মহামায়া** তোমার প্রতি সুপ্রসন্না। বৎস। অবস্থাবৈগুণ্য চিরকাল থাকে না, উত্থান-পতন মানবজীবনের নিত্যঘটনা—ইহাতে বিচলিত না হইয়া যে সমভাবে মনুষ্যত্ব বজায় রাখিতে পারে, লীলাময়ীর শেষপরীক্ষায় তাহার পারিতোষিক বড় মধুর, বড়

মনোরম; মাতৃক্রোড় তাহার পক্ষে চিরশান্তিময় হয়! চল বৎস! আজ তোমাকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, তোমায় পিতৃধনে ধনবান করি।"

পান্নালালের যখন নিজের বাস্তুভিটা নাই—তখন মাতৃপীঠ গঙ্গাতীরই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। এ তীর যখন ভক্ত, অভক্ত প্রভৃতি সকলেরই যুড়াইবার স্থান; জীবিত, মৃত সকল ব্যক্তির সকল সময়ে সমান অধিকার—তখন এইস্থানই দীক্ষাগ্রহণের পক্ষে অতি-প্রশস্ত; **অবধূত** বলিলেন—"বাবা; এইস্থানই ভাল, তুমি, তোমার নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিয়া লও।" **পান্নালাল** মাতৃ-ক্রোড়ে অবতরণ করিয়া প্রভুর আদেশে সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিতে লাগিলেন।

পরম যোগী **অবধূতের** তেজ প্রভাবে গঙ্গাতীর উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল, সে তেজদৃপ্ত অথচ কমনীয় বদনের প্রতি যে চাহিল সেই আর নয়ন ফিরাইতে পারিল না, ক্ষণেকের জন্য যেন মন্ত্র-মুগ্ধ হইয়া সেই আরাধ্যমূর্ত্তির রূপসুধা সকলে পান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে স্নানার্থী যাত্রীগণের জনতা কমিয়া গেল। গঙ্গাতীর জনশূন্য হইল। সিদ্ধসাধক **অবধূত** দশমহাবিদ্যার অষ্টমমূর্ত্তি ছিন্ন-মস্তার মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া **পান্নালালের** কর্ণে তাঁহার সিদ্ধবীজমন্ত্র শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ বজ্র বৈরোচনীয়ে হুঁ হুঁ ফট্ প্রদান করিবামাত্র তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, সে তেজ একেবারে ধারণ করা তাঁহার সামর্থ্যাতীত, শক্তিশালী গুরু তাঁহাকে শক্তি সমন্বিত করিয়া দেবীর গায়ত্রী একবারমাত্র পাঠ করাইলেন—ওঁ বিরোধিন্যৈ বিদ্মহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি, তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ।

সাধকের তখন হৃদয় শক্তিমন্ত, গুরুদেবের প্রযুক্ত তেজ তাঁহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত, একবারমাত্র আবৃত্তি করিতে না করিতে তাহা হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া গেল। পান্নালাল যেন নব-কলেবরে নূতনমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

অবধূত বলিলেন—বৎস! তোমার মন্ত্রগ্রহণ ঠিক হইয়াছে, তুমি ধন্য হইয়াছ, ঐ দেখ তোমার ইষ্টমূর্ত্তি গগণের গাত্রে তোমায় অভয় দিতে বরাভয় হস্তে দণ্ডায়মানা; পার্শ্বে তোমার গৃহদেবতা মহামায়া দেবী। পান্নালাল চাহিয়া দেখিলেন—সেই বিপরীতরতাতুরা, আসব-আবেশাপন্না, গলমুণ্ডবিচ্ছিন্না, নগ্না, সখীদ্বয় সমভিব্যাহারে শোণিতপানমগ্না ইষ্টমূর্ত্তি, পার্শ্বে তাঁহার চিরপরিচিত মায়ামূর্ত্তি। যাঁহার লীলাখেলায় শুধু তিনি কেন ত্রিজগত বিমুগ্ধ, পান্নালালের মানবজন্ম সার্থক হইল। যাঁহার জন্য এত কষ্ট, খেলাধূলার এত বাড়াবাড়ী, যাতায়াতের হুড়াহুড়ি; সেই মহামূর্ত্তি নয়নগোচর করিয়া পান্নালাল ভূমি আলিঙ্গন করিয়া মাতৃপ্রেমে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তারপর যাঁহার কৃপায় তাঁহার এ সৌভাগ্যোদয়, সেই অবধূতের শীতল চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া যুড়াইলেন।

অবধূত বলিলেন—বৎস! যাও, এইবার মহামায়া তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন; এই মন্ত্র জপ করিয়া আপন অভিষ্ট সিদ্ধি করগে।

পান্না। প্রভু! আজ আমার জন্ম সার্থক হলো, এক্ষণে চলুন, গৃহে গমন করিয়া সেবাদি করিবেন।

অবধূত। বাবা! আর আমি গৃহে গমন করিব না, আমি এইস্থান হইতেই প্রস্থান করিব; মা তোমার প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকুন, আশীর্ব্বাদ করি—তুমি সাধনক্ষেত্রে সত্বর উন্নতিলাভ কর। তোমার যখন যে বিষয়ে সন্দেহ হইবে—আমায় স্মরণ করিবামাত্র আসিয়া তাহা অপনোদন করিয়া দিব; আমি কাছে নাই বলিয়া তোমার কোন বিষয় অপ্রতুল হইবে না।

পান্নালাল। আপনার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য, আমি সাধন-ভজনে তিলমাত্র অবহেলা করিব না; এক্ষণে কার্য্যসিদ্ধির জন্য সামান্যমাত্র গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করুন। এই বলিয়া দুইটী রজতমুদ্রা শ্রীগুরুর চরণে অর্পণ করিলেন।

বিনা দক্ষিণায় কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না—ইহা হিন্দুশাস্ত্রের বিধি, এইজন্য অবধূত উহা গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দীনদুঃখীগণকে বিতরণ করিয়া দিলেন। এবং বলিলেন—"বৎস! এখন তোমার বিষয়াশক্তি প্রবল না হইলেও কতক-পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এইজন্য শীঘ্রই তুমি অতুল-ধনের অধীশ্বর হইবে, পূর্ব্বাপেক্ষাও তোমার ধনাগম বেশী হইবে কিন্তু অধিকদিন স্থায়ী হইবে না। ইহাই তোমার শেষ পরীক্ষা জানিবে। ইহার পরই তোমাকে লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইব।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি কখনও নিজের ভাল হইলেই সন্তুষ্ট হয় না, ধর্ম্ম বিষয়ে আত্মীয়স্বজনও যাহাতে মতিমান হয়, দেবতার নিকট তাহাও প্রার্থনা করে। তাই ইষ্টদেব সম্মুখে পান্নালাল বলিলেন—প্রভু! আপনার দাস চুনীর প্রতি কি কটাক্ষপাত করিবেন না, সে কি এইরূপেই দুর্লভ জন্ম নষ্ট করিবে?

অবধূত। না বৎস! সে আর বেশীদিন এরূপ থাকিবে না। তাহার মোহ-ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, অন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শীঘ্রই সে অগ্নিদগ্ধ কষিতকাঞ্চনের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট হইয়া তোমার সহিত মিলিত হইবে।

গুরুদেব আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, **পান্না-লাল**ও দেবতার পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া, কিছুদিনের জন্য তাঁহার আদেশে আবার সংসার-খেলায় মত্ত হইলেন।

দশম পর্ব

অনুতাপানলে

ফাল্গুন মাস—মধুমাসের মধুর প্রভাতে শ্রীবৃন্দাবনের কেশীঘাটের নিভৃতবাটে একটি যুবক উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে বসিয়া শ্যামসলিলা যমুনার লহরীলীলা অবলোকন করিতেছেন। যুবকের ভাব বড়ই-বিষাদজড়িত—দুঃখসন্তাড়িত। অনবরত গণ্ড বাহিয়া নেত্রনীর নিপতিত হইয়া বক্ষ প্লাবিত করিতেছে, কি যেন এক মর্ম্মান্তিক চিন্তায় দেহ কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছে, বদন রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

আজ প্রাতঃকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ্‌-টিপ্‌ বৃষ্টি পড়িতেছে, জন্মাষ্টমীর রজনী শেষ হইয়াছে। আজ নন্দোৎসব তিথি, তাই বৃন্দাবনবাসী কেহ আর যমুনাতটে আসে নাই। দলে-দলে শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে অথবা নন্দালয়ে মহোৎসবে মত্ত।

যুবকের আনন্দ নাই—অবিরল দুঃখদাবানলে যার অন্তঃকরণ জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে; কৃতপাপের জন্য যাহার প্রাণে একটা প্রাণপোড়ান ধিক্কার উপস্থিত হইয়াছে—সে পার্থিব আনন্দে আর কেমন করিয়া মজিবে? হৃদয় পাপশূন্য না হইলেত বিমল-আনন্দ, ধর্ম্মোৎসবের প্রাণমাতান ভাব উপলব্ধি হয় না—কাজেই যুবক এই শুভদিনে এ হেন শ্রীবৃন্দাবনের কেশীঘাটে বসিয়াও তিলমাত্র সুখানুভব করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে যত বেলা হইতে লাগিল, প্রকৃতির ধূসরবর্ণ যেন তত ঘনীভূত হইয়া যুবকের হৃদয়ের অন্ধকারকে বিশিষ্টরূপে প্রগাঢ় করিয়া তুলিতে লাগিল। যুবক হৃদয়ের উচ্ছ্বাস আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। অশ্রুবিজড়িতকণ্ঠে বলিলেন—কেন মরিলাম না, পাইকের হস্তে বিষম-প্রহার খাইয়া আমার জীবলীলা কেন শেষ হইল না, কেন আমি ভাগিরথী সলিলে পতিত হইয়া গভীর স্রোতে ভাসিয়া গেলাম না। তাহা হইলে ত এ মর্ম্মজ্বালা, পাপের এ তীব্র দংশন সহ্য করিতে হইত না। হায়! হায়! না, ভাগিরথী আমার এ পাপপূর্ণ দেহ গ্রাস করিলে বোধ হয় তিনিও পাপে পরিপূর্ণা হইতেন, আমার ন্যায় মহাপাপীর কলুষক্লিষ্ট দেহ গ্রাস করিলে কলুষ-নাশিনীকেও বোধ হয় পাপস্খালনের জন্য বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইত, তাই অভাগার এ পতিত দেহ পতিত-পাবনীর উদরস্থ হইল না। কোথা হইতে এক অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তি সেই দারুণ অন্ধকারে আমার চৈতন্যহীন দেহ কোলে তুলিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলেন আহা! কি কোমল স্পর্শ, দেহ জুড়াইয়া গিয়াছিল; আমার চৈতন্য

হইবামাত্রই সে পরম জ্যোতীর্ম্ময় সন্ন্যাসীমূর্ত্তি কোথায় তিরোহিত হইলেন, আর খুঁজিয়া পাইলাম না। অস্পষ্ট যাহা দেখিয়াছিলাম—তাহাতে বোধ হইল—তিনি আমাদের কুল-দেবতা, আমার বিপদ ঘণীভূত দেখিয়া, মৃত্যু অতি সন্নিকট বুঝিয়া এরূপ মহাপাপীকেও মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়া, পদাশ্রয়ে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। হায়! এত বড় একটা বোম্বেটে দুর্জ্জয় পাপীকে রক্ষা করিতেও দেবতার এরূপ যত্ন-আকাঙ্ক্ষা, মরি-মরি! এত মহত্ব, এত দয়া না হইলে মনুষ্য-সমাজ সে পদে আশ্রয় লইতে এত লালায়িত হইবে কেন? গুরুদেব! যদি বাঁচাইলে তবে দেখা দিলে না—কথা কহিলে না কেন? আমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া অন্তর্হিত হইলেই ত ভাল হইত, তাহা হইলে আর আমাকে পাপের বৃশ্চিকদংশনে এত জ্বালাতন হইয়া, পুনরায় মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতে হইত না। উঃ এ জীবনে—এ জীবনে না করিয়াছি কি? কি এমন মহৎ পাপ আছে—যাহা এ পাপিষ্ঠের দ্বারা অবাধে অনুষ্ঠিত হয় নাই! দেবসদৃশ জ্যেষ্ঠভ্রাতার যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছি, তাঁহাকে পথের ভিখারী করিয়াছি। পরদিন যে কি খাইবেন—তাহার সংস্থান পর্য্যন্ত রাখি নাই! অতবড় উদারচেতা ধনীর সন্তান, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য হইয়া তিনি আজ চারিটী ভাতের জন্য পরের দ্বারস্থ, স্ত্রীপুত্র কোথায় ফেলিয়া দিয়া, অরণ্যে বাস করিতেছিলেন—তাহাও আমার চক্ষে সহ্য হয় নাই, সে অবস্থা হইতেও তাঁহাকে চ্যুত করিয়া যথার্থ বনবাসী সাজাইয়াছি, ধর্ম্মপ্রাণ দাদা আমার তাহাতেও এ হতভাগ্যের প্রতি কখনও কুকথা প্রয়োগ বা কখনও রুষ্ট হন নাই। তাহার পর নরাধম আমি, অর্থের লোভে

পিশাচিনীর মোহমুগ্ধ হইয়া করুণা-প্রতিমা, জননীসমা কুললক্ষ্মীকে কুলের বাহির করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—পাপ-স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপগণ্ড শিশুদের মুখের গ্রাস, সেই দেবীতুল্যা মাতাকে অনায়াসে বনবাস পাঠাইতেছিলাম। ধর্ম্ম যথার্থ এখনও চারিদিক দেখিতেছেন বলিয়া, আমার ন্যায় দুরাত্মার সে বাসনা সিদ্ধ হইতে না দিয়া যথোচিত দণ্ড বিধান করিয়াছেন। হায়! দণ্ডই যদি দিলেন—তবে নিলেন না কেন? তাহা হইলে ত আর এ মর্ম্মপীড়া সহ্য করিতে হইত না। না-না এ পাষণ্ডের এত শীঘ্র যাতনার অবসান হওয়া কোনমতেই উচিত নয়—আমার যে দুর্গতীর এখনও অনেক বাকী,—এরই মধ্যে শেষ হইলে ধর্ম্মের মহিমা প্রচার হইল কই? হায়! দাদা, না, আর এই পাপমুখে দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া কলঙ্কিত করিব না। কিন্তু ভাই! আর দেখা হইবে না—আর তোমায় যন্ত্রণা দিব না, এই আমার শেষ—তাই ভগবানের নিত্য-লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া এ পাপজীবন বিসর্জ্জন দিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। এখানকার ধূলিকণাও পবিত্র, ভগবান এ ক্ষেত্রে নিত্য বিহার করেন—এখানকার অণুপরমাণুও কৃষ্ণময়—শুনিয়াছি আমার প্রাণের দেবতা অবধূত ঘোর তান্ত্রিক হইয়াও অধিকাংশ সময় এইখানে অবস্থান করেন। তাই আসিয়াছি—শেষ আবেদন, মর্ম্মের মর্ম্মঘাতী বেদনা তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের ধূলিকণার সহিত এ পাপদেহ মিশাইতে আসিয়াছি, কিন্তু কই। এতদিন হইল—সে সৌম্য-পবিত্রমূর্ত্তি ত আর দেখা দিলেন না, তবে এ জগতে আর কাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিব? যদি দেহ

বদলাইয়া তোমাদের পদসেবা করিতে অধিকার পাই, তাই আসিয়াছি ভাই! আমি চলিলাম। আর সহ্য হয় না, আমি চলিলাম—এই শেষ। যুবক সন্ধ্যা অবধি সেই শীতল-সমীর-প্রবাহি যমুনার কেশীঘাটে, সেই ঘনঘটাচ্ছন্ন—গুরুনাদপূর্ণ আকাশতলে বসিয়াছিল কিন্তু আর পারিল না উঠিয়া দাঁড়াইল—তটসন্নিধানে যাইয়া বলিল—কুলদেবি মহামায়া! তোমার খেলার সামগ্রী হইয়া এ জগতের সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ কতই হাসিতেছে—খেলিতেছে কিন্তু আমার অদৃষ্টে সে সুখ নাই? তুমি আমায় লইয়া যেরূপভাবে খেলা শেষ করিলে—তাহাতে কেবল কান্নাই সার হইল—এ জীবন আর হাসির পুণ্য-পূতস্রোতে ভাসিবে না বলিয়াই এ জীবন এখানেই শেষ করিব। কষ্টের হাসি হাসিতে চাই না, কষ্টে হাসি আসে না—আসিলেও তাহাতে মধুরতা নাই; ধার্ম্মিক ভিন্ন হাসির মধুরতা আর কাহার মুখে ফুটে না—পাপী যদি কেহ কথন হাসে তাহা অতি-কষ্টসঞ্চিত, আমি সে কৃত্রিম, ধারকরা হাসি হাসিতে চাই না—তাই মাতঃ বসুন্ধরে! আজ তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। অন্ধকারে খরস্রোতা নদীগর্ভে "ঝুপ" করিয়া নিমজ্জনের শব্দ হইল।

সে দিনও জন্মাষ্টমীর উৎসব শেষ হয় নাই—নন্দালয়ে দধীকাদা শেষ করিয়া একটী সন্ন্যাসীমূর্ত্তি আবেগভরে সেই দারুণ দুর্যোগে কেশীঘাটে দৌড়িয়া আসিল। এত অন্ধকারেও সে ব্রহ্মতেজমাথান মূর্ত্তিখানি যেন জ্বলিতেছে, সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বলমূর্ত্তি চিৎকার করিতে-করিতে বলিল—স্থির হ বৎস্য! স্থির হ—পাপীই ভগবানের প্রিয়মূর্ত্তি, পাপী বিনা তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে আর কেহ নাই, পাপীর গতি লক্ষ্মীপতির

গত্যন্তর করিতে—তাঁহাকে মহিমান্বিত করিতে পাপীই একমাত্র অবলম্বন, পাপীর মধ্য দিয়াই ভগবানকে দয়াময় বলিয়া জানা যায়, পুণ্যাত্মায় সে জ্ঞান অসম্ভব; কারণ সে ত তাঁহাকে হস্তগত করিয়াছে—ভাবনার হাত এড়াইয়াছে—সে ত তাঁহার কোন ভরসা রাখে না। তাঁহাকে মহিমামণ্ডিত করিতে পাপীর সাহায্যই আবশ্যক; আয় বাপ! অনুতাপ দগ্ধ হইয়া মলিনকাঞ্চন খাঁটি হইয়াছে, আয় আজ তোকে এই পুণ্যক্ষেত্রে দীক্ষিত করিয়া তোর বংশের কলঙ্ক মোচন করি, তোদের কুল-দেবতা **মহামায়া** অনুকূল হইয়াছেন, অভিশপ্ত-বংশের পুনরুদ্ধার করিতে আবার দেবীর টনক নড়িয়াছে। সন্ন্যাসী শশব্যস্তে অনুসন্ধান করিলেন—তখনও সলিল আন্দোলিত হইতেছে, নিমজ্জনের একটা চিহ্ন দেখা যাইতেছে দেখিয়া তিনিও লাফাইয়া পড়িলেন।

দেখিতে-দেখিতে সেই অতলজলে দুইটী প্রাণী কোথায় ভাসিয়া গেল, আর দেখিতে পাওয়া গেল না। তারপর মেঘ কাটিল—কৃষ্ণানবমীর আকাশ একটু-একটু পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করিল। কত ভক্ত, কত সাধু, কত অবধূত, কত দণ্ডী, খোল-করতালসহ শ্রীসংকীর্ত্তন করিতে-করিতে কেশীঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল কিন্তু তাহার পূর্ব্বে যে লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, কেহ তাহার সন্ধানও পাইল না। সকলেই মনে করিল—পরমানন্দে মগ্ন **পরমানন্দ অবধূত** এ ঘাটে আসেন নাই; উন্মাদনার বশবর্ত্তী হইয়া পাগল-স্বভাব **অবধূত** অন্য কোন ঘাটে চলিয়া গিয়াছেন। সকল ভক্ত একত্র মিলিয়া, কিয়ৎক্ষণ বিভোর-আবেশে ভগবানের

নাম গান করিল—প্রেমোন্মত্ত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিল। তারপর পুত সলিলে অবগাহন করিয়া পবিত্র দেহে, ধীর-স্থিরভাবে গজল গাহিতে-গাহিতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিল। পরমানন্দের সহবাসচ্যুত হইয়া তাঁহারা কিছু বাধা প্রাপ্ত হইলেও প্রাণের তারে সে বিঘ্ন উপলব্ধি করিল না। সকলেই বলিল—গুরুকে আর এখানে না পাওয়া যায়, কল্য হিমালয়ের পাদদেশে তাঁহার আশ্রমে যাইব। শ্রীবৃন্দাবনের এরূপ ভক্তসলিল এখন আর নাই, এখন অনেকটা কৃত্রিমতায় পূর্ণ হইয়াছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শশুরালয়ে

নিজে ভাল হইলে সকলকেই সে ভাল চক্ষে দেখে এবং সকলকে ভাল করিবার চেষ্টা করে। বিশেষতঃ ভাই মন্দ হইলে কাহার প্রাণে সহ্য হয়? চুনীর অধঃপতন দেখিয়া পান্নালাল ও শিবানী কেবল কাঁদিতেন, তাহার মতি পরিবর্ত্তনের জন্য দেবদ্বিজের নিকট অনবরত প্রার্থনা করিতেন।

সংসারের সমস্ত বিষয়ই পান্নালালকে দেখিতে হয়, ইহাতে তাহার ধর্ম্মকর্ম্মের অনেক ব্যাঘাত ঘটে। এ সময় চুনী যদি ভাল হইত, এ সব দেখিত, তাহা হইতে তিনি নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মকর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। কলির পরমায়ু যে প্রায় শেষ

হইয়া আসিল, আর কবে কি হইবে, আমার পথের সম্বল সংগৃহীত হয় নাই, আমি এখনও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়া ত কাল সে কথা শুনিবে না, সময় হইলেই আসিয়া কেশাকর্ষণ করিবে, হায়! চুণী ভাই, তুই কোথায়! আমার পর এ সংসারে যে তোরই দায়ীত্ব বেশী।

আজ অনেকদিন হইল মায়ার আধার পুত্রকন্যাগণকে দেখেন নাই, শিবানীর ভক্তিপ্রীতি-পূর্ণ প্রণয়সম্ভাষণ শ্রবণ করেন নাই, জগতে ইহা যে একটা অতি-বড় লোভনীয়বস্তু, আশ্রমীর পক্ষে এমন প্রিয়বস্তু আর কিছু নাই। শিবপুরে যে পান্নালাল থাকেন, কেবল নিভৃত নির্জ্জন, ধর্ম্মকর্ম্মের উপযুক্ত স্থান বলিয়া, মাসের উনত্রিশ দিন পান্নালাল এই পবিত্রস্থানে মায়ের আরাধনা করেন, এখানেই মনের ঐকান্তিকতা বর্দ্ধিত হইয়া এত শীঘ্র তাঁহাকে সাধনমার্গে এত উন্নত করিয়াছে। ধর্ম্মপথে শক্তির অংশস্বরূপিণী সহধর্ম্মিনী শিবানী ও পুত্রকন্যাগণের সহিত দেখা করিতে হইবে, এইজন্য যদুপতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ধার্ম্মিক যদুপতিকে আশ্রমের ভার দিয়া, তিনি দুই-একদিনের জন্য বরাহনগর যাইবেন, পরের গৃহে তাহাদের ফেলিয়া রাখিয়াছেন, যদিও তাহাদের যত্নের কোনরূপ ত্রুটী হইতেছে না, তথাপি একবার চক্ষের দেখা না দেখিলে, পতিগতপ্রাণা স্বাধ্বী শিবানীর যে কষ্টের সীমা থাকিবে না। যদুপতি যাইবার অনুমতি দিলেন, বয়োজ্যেষ্ঠ যদুপতির প্রতি তাঁহার বিশ্বাস খুব বেশী, বৃদ্ধ যদুপতিও ধার্ম্মিক, বিশ্বাশ স্থাপন করিবার উপযুক্ত পাত্র।

পান্নালাল বলিলেন—আমার দুই-তিনদিন বিলম্ব হইবে, আপনি প্রতিদিন আশ্রমেই থাকিবেন, নিতাই রহিল, কোন কিছু আবশ্যক হইলে, তাহাকে অনুমতি করিবেন। নিতাই চাঁড়াল পান্নালালের সাধনপথের সাহায্যকারী, পরম বিশ্বাসী ভৃত্য। সে কিছুদিন সঙ্গছাড়া হইয়াছিল বটে কিন্তু এখন ঠিক কায়ার ছায়ার মত পান্নালালের সহায়তা করিতেছে। এত কষ্ট, এত অর্থাভাব, কোন-কোনদিন উপবাসও করিতে হয়, তথাপি সে স্থানান্তরে যাইবার চিন্তাও কখন মনে স্থান দেয় নাই।

কোন দূরদেশ হইতে বাটী যাইতে হইলে, পুত্রকন্যার জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে হয়—ইহা সাংসারিক নিয়ম, হাতে কিছুই নাই, যদুপতি বাটী হইতে কয়েকটী খইচুর ও পাটালী আনিয়া দিয়া বলিলেন—পানু! গুরুদেব যে বলিলেন, ছিন্নমস্তামন্ত্রে দীক্ষিত হইলে সে ধনবান হয়, আর আমারও এইরূপ জানা ছিল, কিন্তু কই তাহার সূত্রপাত ত কিছু দেখিতে পাই না। পান্নালালের ন্যায় ধার্ম্মিকের কষ্ট দেখিয়া যদুপতি প্রায়ই এই কথা বলিতেন, তদুত্তরে পান্নালাল বলিতেন, এ সামান্য স্বার্থ যদি সিদ্ধি না হয়, তাহাতে ক্ষতি কি বাড়ুর্য্যে মশাই? মহামায়ার রাজত্বে ত আর কেহ না খাইতে পাইয়া মরিয়া যায় না, সুখে হউক, দুঃখে হউক জীবন রক্ষা হইতেছে, অর্থের মোহে আর যেন আমায় জড়িত হইতে না হয়, আশীর্ব্বাদ করুন মা আমায় সে দায় হইতে রক্ষা করুন।

যদুপতির এ ধর্ম্মমূলক কথা যেন ভাল লাগিল না, তিনি

বলিতেন, যদি ধর্ম্ম সত্য হয়, তাহা হইলে অচিরেই আবার তোমার সৌভাগ্যোদয় হইবে। ব্রাহ্মণের অমোঘ আশীর্ব্বাদবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া খাদ্যদ্রব্য হস্তে পান্নালাল শুভযাত্রা করিলেন।

বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় বরাহনগরের ঘাটে স্নান করিয়া পান্নালাল শশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। বগলা-চরণ তখন বাটী ছিলেন না। স্বামীকে গৃহাগত দেখিয়া শিবানী তাহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসান্তে চুনীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পান্নালাল বিরসবদনে বলিলেন—চুনীর আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না, নিতাই প্রত্যহ কত চেষ্টা করিতেছে, প্রতিদিন কত নূতন স্থানে যাইতেছে কিন্তু তাহার সন্ধান আর কোথাও মিলিতেছে না, বোধ হয় এই শেষের মহাপাপ করিয়া, সে একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়াছে—অথবা কোনপ্রকার দুর্দ্দৈব ঘটাইয়াছে, ভগবান তাহার শেষ পরিণাম কি করিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তাহার সংবাদ পাইতে যতই বিলম্ব হইতেছে, মনে যেন ততই কি একটা বিষম চিন্তা, কি একটা দারুণ সন্দেহ বাড়িয়া উঠিতেছে। হায়! মা মহামায়া, দারুণ ঘটনাচক্রে ফেলিয়া বেশী নয় একটা ভাইয়ের সঙ্গেও কি চির বিচ্ছেদ ঘটাইবি? সে এত অত্যা-চার করিয়াছে, এত দুর্ব্ব্যহার করিয়াছে, কিন্তু একটী দিনের জন্যও ত মা আমি তাহাকে প্রাণ হইতে ছাড়িয়া দিতে পারি নাই, ঠিক ছোট ভাইয়ের মত, প্রাণের পুত্তলীর মত তাহাকে প্রাণের মাঝেই স্থান দিয়া আসিয়াছি, মনে-মনে বিশ্বাস করিয়া আছি—মা! তুই যদি

থাকিস্, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার হাতেগড়া ধন চুণী আবার ভাল হইবে, আবার দাদা বলিয়া আবদার করিবে—আমি আবার তাহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া হৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিব—কই মা? তা ত কই হইতেছে না? মনোময়ী মা! মানবমনের উপর তোমার ত সকল আধিপত্য আছে; দে মা, চুণীকে আমার ফিরাইয়া, তাহার মতি পরিবর্ত্তন করিয়া দে, আমি ভাইকে লইয়া সকল জ্বালা নিবৃত্তি করি।"

স্বামীর কথা শুনিয়া শিবাণী অশ্রুজলে ভাসিতেছিল, দেবরের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না—শুনিয়া তাঁহার প্রাণ বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া গিয়াছে। দুষ্ট হউক, পাপিষ্ঠ হউক, স্বামীর সোদর ও তাঁহার শ্বশুর-কুলের পিণ্ডাধীকারী ত বটে, আপদে বিপদে সহায় ত নিশ্চয়, এখন না হয় মন্দ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মহামায়ার ইচ্ছা হইলে মানুষের মন ফিরিতে, ধর্ম্মপথের পথিক হইতে কতক্ষণ লাগে? স্বামী-স্ত্রীর শোক উথলিয়া উঠিয়াছে কিন্তু তাঁহাদের ভাব গতিক দেখিয়া হাসিতেছে একজন, সে ভানুমতী, ভানুমতী বিদ্রূপচ্ছলে বলিল—সে বোম্বেটেটার জন্য আবার দুঃখ কি, অমন ছেলে থাকার চেয়ে যাওয়াই ভাল; যে অর্থের জন্য নিজের কুলবধূকে পরের হাতে সমর্পণ করিতে পারে—সে কি মানুষ না পিশাচেরও অধম?

ভানুমতী স্ত্রীলোক—অল্পবুদ্ধি, বোঝে না যে একটা কুল-পাংশুল পুত্র হইলে বংশের কি দুর্গতী হয় এবং তদ্বংশীয় জীবিত ব্যক্তিগণের কি মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হয়, হাজার দোষ করিলেও যেন

ঢাকিয়া রাখিতে, লোকলোচনের অন্তরালে লইয়া স্বতঃই ইচ্ছা হয়, কিন্তু সর্ব্বদর্শী চক্ষু ত তাহা হইতে দেন না, ধর্ম্মের ঢাক যে আপনাপনিই বাজিয়া উঠে, বায়ু স্পর্শে যে তাহার নিনাদ চারিদিক প্রতিধ্বনিত করে।

ভ্রাতৃজায়ার কথা শুনিয়া দুঃখিতস্বরে শিবানী বলিলেন—ভাই! ভগবান না করুন, বংশের একটা ছেলে নষ্ট হইলে যে কি কষ্ট হয়, তাহা তোমার ন্যায় বালিকার এখন বুঝিতে বাকী আছে। এ মর্ম্মান্তিক কষ্ট যেন শত্রু দুষ্মনকেও ভুগিতে না হয়।

শিবানীর কথা শুনিয়া ভানুমতী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—তা-বলে কি সমস্তদিন ভাবিতে হইবে, এদিকে বেলা যে যায়—তোমার খিদে তেষ্টা নেই বলিয়া কি ঠাকুর-জামাইয়েরও কি সমস্ত উড়ে গেছে?

শিবানীর চমক ভাঙ্গিল, তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া আহারের স্থান করিয়া দিলেন। পান্নালাল ভোজনে বসিলেন। শিবানী ছোট খোকাটীকে কোলে করিয়া বীজনহস্তে ব্যজন করিতে লাগিলেন। তাহার কন্যাটী ও বগলাচরণের পুত্রটী খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল; এক একবার পান্নালালের স্নেহের কন্যা প্রভাবতী আসিয়া পিতার সহিত ভোজন করিবার আবদার করিতে লাগিল কিন্তু জননীর নয়নের ইঙ্গিতে শাসিত হইয়া আর সে, সে দিকে আসিল না। ভানুমতী ঠাকুর জামাইয়ের কি চাই, কি না চাই তাহার জন্য রন্ধনশালায় অপেক্ষা করিতেছিল। যখন পান্নালাল গাত্রোত্থান করিলেন—তখন তিনি

আসিয়া নিজ পুত্র দুইটী ও প্রভাবতীকে খাওয়াইতে বসিলেন।

হিন্দু-স্ত্রীর স্বামী-সেবার ভাব ভাবিয়া পাওয়া যায় না—ইহা যে কত মধুর, ধর্ম্মের সহিত ইহা যে কেমনভাবে বাঁধা, তাহা যতই চিন্তা করা যায় ততই প্রাণ মোহিত হইয়া পড়ে—যেন জন্ম-জন্ম এই ধর্ম্মনদে ডুবিয়া আত্মহারা হইতে ইচ্ছা করে। ধর্ম্মের যে কি মহিমাময়ী শক্তি ইহার মধ্যে অণুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; তাহার বিশ্লেষণ করা দুঃসাধ্য; তাই হিন্দুর দাম্পত্য-প্রণয় অপার্থিব—স্বর্গীয়, ইহার সহিত কোন প্রণয়ের তুলনা হয় না, তাই ইহার বন্ধন জীবনে-মরণে দুশ্ছেদ্যরূপে দৃঢ় থাকে; মরণের পরও পুনর্ম্মিলন হিন্দুর দাম্পত্যপ্রণয়ে বিধিবদ্ধ। শিবানী যেদিন ভাবিয়াছেন—প্রভু আজ আসিবেন; ঠিক সেইদিনই পান্নালালের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা প্রাণের টান, বাহ্যিকপ্রণয়ের আসঙ্গ-লিপ্সা নহে। স্বামীর ভোজনের পূর্ব্বে স্ত্রীজাতিকে ভোজন করিতে নাই—তাহা হইলে স্বামীর আয়ুক্ষয় হয়—ইহা ব্যবহারিক শাস্ত্রসম্মত সত্য। পান্নালাল দূরে অবস্থান করেন কিন্তু এমন একদিনও হয় নাই যেদিন শিবানীর আহারের পর পান্নালাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; সতী যেন জানিতে পারিতেন—আজ প্রাণপতির আগমন হইবে—এইজন্য তিনি সেদিন আহারে বিরত থাকিতেন; দেবতা আসিয়া আহার করিলে—তার পর প্রসাদলাভে ধন্য হইতেন। শিবপুরের তপোবনে থাকিবার কালেও তাঁহার ভোজনের একটা সময় আছে; শিবানী বরাহনগরে

থাকিয়া প্রতিদিন সেই সময়ের পর স্বামীকে নিবেদন করিয়া দিয়া প্রসাদ খাইতেন। ইহা ছাড়া স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা আর কাহাকে বলে, এ ভাব আমাদের স্ত্রীজাতিরই নিজস্ব, ইহা অন্য কোথাও নাই; তাই আমাদের স্ত্রীগণ পরীক্ষার সময় অগ্নিকেও শীতল করিতে পারিয়াছে, কালকেও কলা দেখাইয়া আপনার অভীষ্টসিদ্ধি করিয়াছে। সাবিত্রী।

আহারাদির পর পান্নালাল একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পত্নী তাঁহার শয়নে পরিচর্য্যা করিয়া রন্ধনশালায় আসিলেন; ভানুমতী তখনও দ্বারে বসিয়া আছেন। শিবানী তাঁহাকে আহারাদির পরিবেশন করিতে বলিলেন। ছোট-ছোট বালকবালিকাগুলি পান্নালালের আশে-পাশে গিয়া শয়ন করিল। পাঠকগণ হয় বলিতে পারেন—পান্নালাল আসিয়াছেন—শিবানীই না হয় স্বামীর ভোজন অবধি উপবাস রহিলেন—ভানুমতীর থাকিবার আবশ্যক কি? তদুত্তরে আমরা বলি—স্বামী দেবতা; তাঁহার আহারান্তে স্ত্রীর সেবা ত অবশ্য কর্ত্তব্য; গৃহের অন্য পুরুষ, এমন কি ভৃত্যাদির ভোজন না হইলেও হিন্দু-স্ত্রী পান-ভোজন করিবে না—এরূপ যদি না হইবে, তবে আর ধর্ম্মের সংসার আখ্যায় ইহা আখ্যায়িত হইবে কেন?

বেলা পড়িয়া আসিল—পান্নালাল সেইদিন চলিয়া আসিবেন মনে করিয়াছিলেন কিন্তু প্রভাবতী পিতাকে এমন করিয়া ধরিল যে ছাড়িয়া আসা দায়—সে বালসুলভ আবদারে বলিল—বাবা! আজ যাইতে দিব না, তারপর বগলাচরণ আসিয়াও

অনুরোধ করিল—চাটুর্য্যেমশায়! আজ থাকুন; ও বেলা ভাল আহারাদি হয় নাই; বাটীর স্ত্রীগণেরও অনুরোধ, বিশেষতঃ ভানুমতী আসিবার পথে বড়ই বাধা দিতে লাগিল—বলিল—কেন? জাতি যাবে না ত; কেহ দু-কথা শুনাইবার নাই ত—তবে এত তাড়াতাড়ি কেন? কাল নয় আহারাদি করিয়া বৈকালে যাইলেই হইবে। সকলের উপরোধ অনুরোধ বিশেষতঃ মায়ার প্রতিমূর্ত্তি প্রভাবতীর ভার-ভার মুখের প্রতি চাহিয়া পান্নালাল সেদিন আর পা বাড়াইতে পারিলেন না। পুত্রটী প্রায় এক বৎসরের হইয়াছে; এতদিনের মধ্যে এই তাহার প্রথম বরাহনগরে রাত্রিযাপন; ইহার পূর্ব্বে আর কখন তিনি শ্বশুরবাটী আসেন নাই, রাত্রিযাপন করেন নাই। পিতা মাতাকে ছাড়িয়া পান্নালাল একদিনও কোথাও নিশিযাপন করেন নাই; তাঁহারা জীবিত থাকিতে স্নেহের বধূমাতাকেও কখন এতদিন বাপের বাড়ী থাকিতে হয় নাই।

সেদিন ভগ্নীপতি ও শ্যালকে কত সুখ-দুঃখের কথা, কত প্রাণের কথা হইল। অপরাপর বালকবালিকাগণ সন্ধ্যার পরই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু প্রভাবতী পিতার জাগরণ সময় অবধি ঠিক সমভাবেই জাগিয়াছিল; পিতার কাছে-কাছেই ফিরিয়াছিল; যখন যা আবশ্যক হইতেছিল—তখনই তাহা আনিয়া দিয়া পিতৃপূজার আরম্ভ সূচনা করিয়া রাখিতেছিল। হায়! এ জগতে কন্যার তুল্য মায়াবিনী আর কে আছে?

বহির্ব্বাটীতে বগলাচরণ ও পান্নালাল বসিয়া নানা

ধর্ম্মকর্ম্মের কথা কহিতেছেন—**শিবপুরের** জলবায়ু কিরূপ তাহার প্রসঙ্গ উত্থিত হইয়াছে; বালিকা **প্রভাবতী** হাঁ করিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া সমস্ত কথা শুনিতেছে। কথায়-কথায় কোষ্ঠীবিচারের কথা উঠিলে—**বগলাচরণ** বলিল—চাটুর্য্যেমশায়! আমি একদিন দিদির কাছ থেকে তোমার কোষ্ঠীখানি লইয়া একটী ভাল গণৎকারকে দেখাইয়াছিলাম, তিনি বলিলেন—এই লোকের অতি-সত্বরই পুনরায় সৌভাগ্যযোগ হইবে; এরূপ সৌভাগ্য বোধ হয় যার তার হওয়া সম্ভব নহে। রাজযোগেরই যোগাযোগ, ধর্ম্ম-কর্ম্মও যেমন হইবে—আর অর্থাদির সমাবেশও তদ্রূপ, রাজ্যলাভই তাহার ফল। তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন—ইহার কি কোনও সূত্রপাত দেখিতেছ?

পান্নালাল হাসিয়া বলিলেন,—ভাই! **মায়ার খেলা** কে বুঝিবে? তবে আর অর্থাদির যোগ না হওয়াই ভাল—উহাতে কেবল কষ্ট বই সুখ নাই; দুইদিন আছে, দুইদিন নাই—ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট, তার চেয়ে একভাবে কাটিয়া যাওয়াই আমি সুখ বলিয়া বিবেচনা করি।

বগলাচরণ একটু ক্ষুণ্ণমনে বলিল—তবে কি তুমি কোষ্ঠীর ফল মান না?

পান্নালাল। মানি না কেন, হিন্দুর জ্যোতিষশাস্ত্রটাকে মানি না এ কেমন কথা, হিন্দুমাত্রকেই অবনত মস্তকে উহা মানিতে হইবে; উহার প্রত্যক্ষ ফল হাতে-হাতে পাওয়া যায়; তবে উহা ঠিক লোকের দ্বারা প্রস্তুত হওয়া চাই, কিন্তু সেরূপ লোক কয়জন?

বগলাচরণ। কর্ত্তা তোমার নষ্ট-কোষ্ঠী ভাল লোকের দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন—আমি তাহা বেশ জানি।

পান্নালাল। তা হউক, আর আমার বিষয়-আশয়ে মজিতে প্রাণ চায় না, অনর্থ অর্থে পরমার্থের অনেক হানী হয়। অর্থ কেবল ইহকালের বই ত নয়—পরকালের উপকার ইহাতে বেশী হয় না। বরং সময়ে-সময়ে সে পথ ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া দেয়—তবে জনক রাজার মত উপযুক্ত হইয়া, বিষয় ভোগ করিতে পারিলে অনিষ্ট হইবার ভয় খুব কম।

বগলাচরণ। সে কথা সত্য বটে, কিন্তু সংসারীর পক্ষে অর্থ ত না হইলেও চলে না।

পান্নালাল। যাহারা কেবল সংসারী হইয়া থাকিতে চায়—ইহার সুখ-দুঃখ, মান-সম্ভ্রম যাহাদের একমাত্র উপাস্য বস্তু, তাহাদের অজস্র অর্থের আবশ্যক বটে, পান থেকে একটু চূণ খসিলেই যাহাদের প্রাণে বাজে, যাহারা একটুকুও কষ্ট সহ্য করিতে পারে না, মানের একটু হানী হইলেই যাহারা বিষম অপমান বোধ করে, তাহাদের পক্ষে অর্থ বিশেষ দরকার। আর যাহারা ভোগের অপেক্ষা ত্যাগের মহিমা বুঝিয়াছে, তাহারা পাঁকাল মাছের মত থাকিতে চায়—পাঁকে থাকিবে অথচ গায়ে কাদা লাগিবে না। এইরূপ বিষয় ভোগেই সুখ, গেলে হা-হুতোশী করিতে হয় না।

বগলাচরণ। কর্ত্তা যে বিষয় ভোগ করিতেন, তাহার কি কোন গোল ছিল, না বিষয়ের মমতা তাঁহাকে একদিনের জন্য অস্থির করিতে পারিয়াছিল?

পান্নালাল। বাবার মত বিষয় ভোগ করি বা করিতে পারি, ভগবান সেরূপ সাহস, সেরূপ তেজ, সেরূপ প্রবৃত্তি দিন না, তখন বিষয়ে ডুবিয়া থাকিলেও ভয় হইবে না। ভগবানের লীলা বলিয়া তখন অনায়াসে সকল কার্য্য সমাধা করিয়া যাইব। কিন্তু আমার সে তপস্যা কোথায় ভাই?

বগলাচরণ। আমার যেন ভাই জ্যোতিষীর কথায় দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, তোমার পুনরায় সৌভাগ্য দেখা দিতে বোধ হয় বেশীদিন বিলম্ব নাই।

পান্নালাল। ভাই! মায়ের ইচ্ছা যদি হয়—তিনি যদি পুনরায় সং সাজাইতে চাহেন ত রোধ করিবার ক্ষমতা কার? তবে যাহাই করুন, অর্থের জন্য যেন ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে না হয়।

দুইজনে এইরূপ নানা সৎপ্রসঙ্গ করিতে-করিতে রাত্রি অধিক হইল; **প্রভাবতী** ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; ঠাকুর-জামাইকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে হইবে বলিয়া, **ভানুমতী** আজ কত কি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছিলেন, তাই এত রাত্রি হইয়া গেল। রাত্রি দশটার পর পাকাদি সম্পন্ন হইলে, আহারের জন্য অন্দরে ডাক পড়িল। **পান্নালাল** ও **বগলাচরণ** বহুদিনের পর একত্র আহারাদি করিয়া বেশ পরিতৃপ্তিলাভ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে স্ত্রীলোকদিগের আহারাদি সমাপন হইলে সকলে শয়ন করিলেন। **পান্নালালের** কোষ্ঠীর ফল ধনবান হওয়া—**বগলাচরণ** ইহা কোন ভাল জ্যোতিষীকে দেখাইয়া স্থির

করিয়াছেন। পান্নালাল বড়লোকের ছেলে ছিলেন, তাহার পর অদৃষ্টের প্রখর তাড়নায় দরিদ্রতার নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছেন। ইহাতে যে তাঁহার কোনরূপ অসহ্য কষ্ট হইয়াছে—তাহা তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহার সহিত ব্যবহার করিলে, বিশেষ জানা যায় না; শিবানীও বড় ঘরের পুত্রবধূ ছিলেন, এখন নাই বলিয়া যে তাঁহারও কোন বৈলক্ষণ্য হইয়াছে—তাহার কোনপ্রকার আভাষ কেহ কখন পায় নাই। তবে অর্থ থাকায় আর না থাকায় তাঁহাদের যায় আসে কি? যত কিছু দুর্দ্দৈব উপস্থিত হউক না, সত্য বজায় রাখা যাঁহাদের ধর্ম্ম তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব কি আছে? রতন ঠাকুর স্ত্রী-পুত্র এবং পুত্রবধূকে উপদেশ দিতেন—সত্য ঠিক রাখিবে—সর্ব্বদা সত্যকথা কহিবে; ব্রাহ্মণের কথায় যেন কখন অসত্য প্রকাশ না পায়—এবং যাহা কহিবে—তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করিতে হইবে—ইহা যেন মনে থাকে, বাক্যের কখন অন্যথা করিবে না—তাহা হইলে ভগবান নারাজ হইবেন; তাঁহার করুণালাভ করিতে হইলে, সত্যপ্রিয় এবং বাক্‌প্রিয় হওয়া একান্ত আবশ্যক।

পান্নালাল ও শিবানী সেই উপদেশই প্রাণপণে পালন করিয়া আসিতেছেন। মিথ্যাকথা তাঁহারা প্রাণ থাকিতে বলিতে পারিতেন না; ইহাতে যত অনিষ্ট হয় হউক; আর এইজন্যই তাঁহারা পিতার সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। নতুবা যদি আধুনিক চরিত্রের মত একটু সামান্য খেলা খেলাইতেন—তাহা হইলে কি আর তাঁহাদিগকে পরিণামে অর্থহীনতার জন্য এত কষ্ট পাইতে হইত? এই গুণে গুরু

দয়ানন্দ তাঁহাদিগকে এত ভালবাসিতেন,—এবং দীক্ষা প্রদানের পর—পান্নালালকে আদর করিয়া "সত্য-কিঙ্কর" বলিয়া ডাকিতেন। যদুপতিও তাঁহার এই গুরুদত্ত নামে আহ্বান করিয়া বিশেষ তৃপ্তিবোধ করিতেন।

প্রভাত হইল। তপোবনে কেহ নাই, নিতাই চুণীর অন্বেষণে আজ তিনদিন বাড়ী ছাড়া, কাজেই তাঁহার আর বরাহনগরে থাকা হইল না, আর পান্নালাল মন্ত্র গ্রহণের পর এখন নির্জ্জনবাসের প্রয়াসী হইয়াছেন, শিবপুরের এই তপোবনসদৃশ আলয়ে তিনি স্বর্গের সুখ ভোগ করেন—আর কোথাও থাকিতে যেন তাঁহার ইচ্ছা হয় না।

স্বামীর পূজাদিকার্য্য সমাধা হইলে, কিছু জল-খাবার প্রদান করিয়া হাসিতে-হাসিতে শিবানী বলিলেন—"প্রভা আর এখানে থাকিতে চায় না—সে প্রত্যহই বড় আবদার ধরে।" নিজের মনোগত ইচ্ছা কন্যার নামে দিয়া পতির নিকট জ্ঞাপন করিলে পান্নালাল বুঝিলেন, পরে বলিলেন—"আর বেশীদিন তোমাদিগকে এখানে থাকিতে হইবে না।"—আশ্বাস দিয়া সেইদিনই আহারাদির পর বৈকালে পান্নালাল শ্বশুরালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গার ধার দিয়া শিবপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভাগ্য ফলিল

দিবসের রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছে—প্রকৃতি একটু শীতল হইয়াছে। **পান্নালাল** আনমনে মাতৃনাম জপমালা করিতে-করিতে চলিয়াছেন। সংসার-চিন্তা বেশীক্ষণ মনে করিয়া তোলাপাড়া করিতে **পান্নালাল** ভালবাসিতেন না; যখন যে ঘটনা ঘটিত, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিয়া আপনার ইষ্টচিন্তায় মন দিতেন।

বাটী হইতে বাহির হইয়া তাঁহার আর কোন কথা মনে নাই। লোকের স্বভাব যেমন একটা কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, বা কোন কথা শুনিলে, সেই কথা লইয়া সময় অতিবাহিত করে, কোন গুরুতর বিষয় হইলে তাহা সম্পাদন করিয়া আস্ফালন করিতে সকলেই ইচ্ছা করে কিন্তু **পান্নালাল** তাহা করিতেন না। ভগবচ্চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তায় তাঁহার চিত্ত বেশীক্ষণ সংযত থাকিত না, যত শীঘ্র সম্ভব তিনি তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করিতেন। পত্নী এত করিয়া অনুরোধ করিলেন, তিনি যে সে কথা ঠেলিয়া ফেলিলেন—তাহা নহে; **শিবপুরে** যাইয়া তাঁহার অভিভাবকস্বরূপ **যদুপতির** সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা হয় করা যাইবে, তবে সেই চিন্তা লইয়া যে সদাসর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইবে—তাহা তিনি পারিতেন না।

বর্ষাকাল হইলেও স্থানে-স্থানে ভাসা-ভাসা মেঘে যদিও গগনগাত্র

আবৃত, তথাপি প্রকৃতির অবস্থা দেখিয়া সত্বর বৃষ্টিপাত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। প্রবল বাতাস বহিতেছে, মা জাহ্নবী সতেজ-ভরে কূলে-কূলে ভরিয়া উঠিয়াছেন। পূতসলিলে বর্ষা নামিয়া হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিয়াছে, গেরুয়া বসনে আবৃত হইয়া মা পরম পুলকিত মনে তরঙ্গভঙ্গে সাগরপানে ছুটিয়াছেন, ভক্তের হৃদয়ে মায়ের এ সন্ন্যাসিনীমূর্ত্তি বড়ই মনোরম—বড়ই আশাপ্রদ। পান্নালাল অন্যমনস্ক হইয়া চলিয়াছেন। কিয়দ্দূর আসিয়া দেখিলেন—তীরে অনেক বড়-বড় তরণী লাগিয়াছে; বহুদূর ব্যাপিয়া এই নৌকাশ্রেণী—গুড়ের বহু কিস্তি আনিয়াছে; নাবিকগণ নৌকা হইতে নামিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে; কেহ বা আহারাদির উদ্যোগ করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে; কেহ দন্তধাবণ করিয়া বস্ত্রাদি ধৌত করিবার উপক্রম করিতেছে। অন্যান্য নাবিকগণ নিশ্চেষ্ট, দারুণ অবসাদ বশতঃ নৌকার চত্বরে পড়িয়া তখনও গান গাহিতেছে। মাঝি-মাল্লারা মূর্খ হইলেও পবিত্র গঙ্গাতীরের এই খোলা হাওয়ায়, তাহাদের খোলা প্রাণে-তোলা মাতৃ-সঙ্গীতগুলি গাহিয়া ভাবুক-প্রাণে যে কি মধু ছড়াইয়া দিতেছে—তাহা যে শুনিয়াছে—সেই বলিতে পারে। একটী নৌকার একটী মাঝি বেশী বুড়োও নয়, বেশী যুবাও নয়—আধা বয়েসী, নৌকার উপর পড়িয়া গাহিতেছে :—

অন্তে পদপ্রান্তে মোরে
রেখো গো মা সুরধুনী ;
ভয়ে ডাকি ওমা গঙ্গে ভয়-ভঙ্গিনী রঙ্গিণী।

জনক জননী দারা সুত বন্ধু-বান্ধবে,
নয়ন মুদিলে গঙ্গে কেহ না সঙ্গে যাবে,
ভব-সঙ্কটেতে তব ভরসা মা জননী॥

মাঝি ছোটলোক, কিন্তু এ গানটীতে তাহাকে তত ছোট বলিয়া বোধ হইল না; তখনকার সকল লোকই প্রায় স্বাধীনজীবি ছিল, ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও অনেকে চাষ-আবাদের কাজ করিত—এ লোকটীও বোধ হয় তাই; সে বিভোর হইয়া গাহিতেছিল, **পান্নালাল**ও তীরে বিভোর হইয়া শুনিতেছিলেন। তখনও অনেক বেলা আছে, গাহক গান ছাড়িয়া তীরে আসিল। **পান্নালাল** যেখানে বসিয়াছিল—তথায় আসিয়া দাঁড়াইল, এবং তাঁহাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া পদধূলী গ্রহণ করিল।

পান্নালাল আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"বাপু! তোমার কণ্ঠস্বর ত বেশ মধুর; বেশ ত ভক্তির সহিত গানটী গাচ্ছিলে?"

আগন্তুক। আজ্ঞে, সে আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

পান্নালাল লোকটীর সরলতা দেখিয়া বলিলেন,—"বাপু! এই নৌকার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ?"

আগন্তুক। মশাই! দেশে আমাদের চাষ-আবাদ আছে; বৎসরে একবার করিয়া গুড় বিক্রয় করিতে আমরা **কলিকাতায়** আসিয়া থাকি, এ বৎসর তাই আসিয়াছি। এই সকল গুড়ের কিস্তি আমি লইয়া আসিয়াছি; অনেক মহাজনের গুড় আমার

সঙ্গে চালান আসে, তাহাদের আসিবার সময় হয় না—আমি তাহাদের বিক্রয় করিয়া টাকা প্রদান করিব—আমার উপর তাহাদের বিশ্বাস আছে।

পান্নালাল। কত টাকার গুড় হইবে?

আগন্তুক। এখন বাজারে দর জানি না—তবে ৩৲ টাকার কম নহে। তাহা হইলেই দেখুন না!

পান্নালাল। কত মণ গুড় আছে?

আগন্তুক। ২০।২৫ হাজার মণ হইবে? আপনি কি কিনিবেন?

পান্নালাল। এক্ষণে ত টাকা নাই; মনে-মনে বলিলেন—"তবে চেষ্টা করিলে হইত, **যদুপতিও** এইরূপ মাল ক্রয়ের পক্ষপাতী, তাঁহার জন্ম বায়না করিলেও মন্দ হয় না।"

আগন্তুক। ঠাকুর মশাই ভাবছেন কি? বায়না করুন না, তার পর যোগাড় করে দিবেন।

কি জানি মায়ের কি খেলা খেলিতে ইচ্ছা হইল। **পান্না-লালের** প্রাণে গুড়গুলি বায়না করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিলেন। **যদুপতি** একবার এইরূপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তবে এই ত সুযোগ! সংসার-বাসনায় উদাসীন, ধর্ম্মভীরু **পান্নালাল** কি জানি কোন্ মোহের ঘোরে তাঁহার মাতুলের গৃহ-বিক্রয়ের অংশের যে ৫০৲ টাকা সঙ্গে ছিল, তদ্দারা-বায়না করিয়া ফেলিলেন; অগ্র-পশ্চাৎ কিছু বিবেচনা করিলেন না।

বাড়ুর্য্যেমহাশয় টাকা দিবেন—এই তাঁহার আশা। কিন্তু এত

টাকা সংগ্রহ হইবে কি না, এত টাকা তাঁহার আছে কি না কিছুই স্থির করিলেন না; কোন এক দৈব প্রেরণায় তিনি অনায়াসে ৫০৲ টাকা দিয়া লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য সওদা করিলেন। তখন লোকের মনে এত অবিশ্বাস বদ্ধমূল হয় নাই; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে অমান্য ও অবিশ্বাস কেহ করিত না; তিনি তাঁহার নিজের কোন বন্ধুর জন্য সমস্ত গুড় খরিদের বায়না করিতেছেন, মহাজনের আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? গঙ্গাগর্ভে বসিয়া পান্নালাল মহাজনের সহিত চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া প্রস্থান করিলেন; কথা রহিল ১৫ দিবসের মধ্যে সমস্ত চুক্তির টাকা দিয়া মাল তুলিয়া লইয়া যাইবেন।

যদুপতি সময়ে-সময়ে এইরূপ কারবার করিতেন; এইজন্য পান্নালালকে তিনি ধনবান হইবার এরূপ অনেক পন্থা সময়ে-সময়ে বলিয়া দিতেন কিন্তু পান্নালাল বহু বিষয় ভোগ করিয়াছেন। বিশেষতঃ পিতার বিষয়-আশয় ছারখার হইবার পর হইতে তিনি একপ্রকার হতাশ হইয়াছেন, আর পার্থিব অর্থে মজিবার ঝোঁক নাই। দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে তাঁহার আর এ সকল কাজে মনোনিবেশ করিবার আদৌ সময় নাই বলিলেই হয়। সদাসর্ব্বদা জীবনের মহাব্যাপারের লাভ-লোকসান দেখিবার জন্য; ভব-সংসারে পাপপুণ্যের হিসাব-নিকাশের জন্য তাঁহার মন সদাই ব্যস্ত; পার্থিব ক্রয়বিক্রয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্যে তাঁহার বড়লোক হইবার মানস আর নাই; তবে গুরুও বলিয়াছিলেন—"তোমার সৌভাগ্য আবার ফিরিবে এবং যদুপতিও সময়ে-সময়ে

বলেন—তিনি যে মন্ত্রে দীক্ষিত, তাহাতে ধনবান হইবারই কথা, এখনও তাহার কোনপ্রকার সূত্রপাত কেন হইতেছে না—তাহা কে বলিবে?” পান্নালাল আজ কিন্তু কোন্ অদৃষ্টপূর্ব্ব, অজ্ঞানিত শক্তির প্রেরণায় একটা মহা-দায়ীত্বপূর্ণ কাজ করিয়া বসিলেন—মনে করিলেন—বাড়ুর্য্যেমহাশয়ের একটা মহাকাজ করিলাম—ইহাতে তাঁহার খুব আনন্দ হইবে। হাসিতে-হাসিতে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু আসিয়া নিতাইয়ের মুখে শুনিলেন—যদুপতির ভয়ানক পীড়া, সেদিন অনেক রাত্রি হইয়াছিল বলিয়া আর দেখা করিতে যাইতে পারিলেন না। প্রাতেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন কিন্তু অবস্থা দেখিয়া কাজকর্ম্মের কথা কিছুই উত্থাপন করিতে পারিলেন না, এ অবস্থায় এ বিষয়ের কাজকর্ম্ম কে করিবে? পীড়া যে সঙ্কট!

পান্নালাল ভগবানের নিকট সেই পরমোপকারী ব্রাহ্মণের আশু রোগ-শান্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি যে তাঁহার আশায় একটী বৃহৎ গুড়ের কিস্তির বায়না করিয়াছেন—পনর দিনের মধ্যে টাকা দিতে না পারিলে, তাহা যে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে—তাঁহার শেষ-সম্বল ৫০৲টী টাকা যে বৃথায় নষ্ট হইবে—ইহার জন্য তিনি কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। বন্ধুর জন্য একটা কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে যদি টাকা পঞ্চাশটী নষ্ট হয়, তাহার জন্য অনুশোচনা কি? পান্নালালের অনুশোচনা করা অভ্যাস ছিল না, মায়ের কাজ তিনি করাইয়াছেন, লাভ লোকসান তাঁহার, সেজন্য আমার চিন্তার কারণ কি? তিনি মিথ্যাকথা বলিতে জানিতেন না, টাকা হাতে

থাকিলে সঞ্চয় না করিয়া তাহার সদ্ব্যয় করিতেন; পারত্রিক চিন্তা ব্যতীত ঐহিক চিন্তায় বেশীক্ষণ লিপ্ত থাকিতেন না; মনে আসিলেই কার্য্য করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা মন হইতে অপসারিত করিতেন, এইজন্য **অবধূত** তাঁহাকে **সত্য-কিঙ্কর** বলিয়া ডাকিতেন—ইহা প্রচলিত নাম না হইলেও গুরুদত্ত নাম—**পরমানন্দ** আশ্রমে তাঁহাকে ঐ নামেই আহ্বান করিতেন।

পান্নালাল আবার জপতপে মনোনিবেশ করিলেন; মাতৃপূজায় আবার তাঁহার চিত্ত স্থির হইল। **নিতাই** দুই-একদিনের পর আবার প্রভুর আদেশ লইয়া **চুণীর** সন্ধানে বাহির হইল। **পান্নালাল** নিভৃত তপোবনে **মহামায়াকে** উদ্বুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যতবারই ধ্যানস্থ হন, তাঁহার স্নেহের কন্যা **প্রভাবতী** যেন অপূর্ব্ব প্রভাজালে বিমণ্ডিত হইয়া ততবারই তাঁহার চারিধারে ঘুরিয়া বেড়ায়—কন্যা যেন পিতার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না। ইহা কোন বিশেষ-শুভলক্ষণ বিবেচনা করিয়া **পান্নালাল** উৎফুল্লহৃদয়ে আরও গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। প্রত্যহ পূজাদির পর বৃদ্ধ **যদুপতিকে** দেখিতে যাইতেন; **যদুপতির** গৃহেই তাঁহার ভোজনকার্য্য সমাধা হইত। এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাকে গৃহে ভোজন করাইতে পারিলে গৃহ যে পবিত্র হয়—**যদুপতি** তাহা জানিতেন; তাঁহার স্ত্রী **পান্নালালকে** পুত্রের মত স্নেহ করিতেন; কোন পুত্র না থাকায় তাঁহার যাবতীয় স্নেহ তাঁহারই উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া যে অদৃষ্টদেব মানবের অদৃষ্ট গঠন করেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারা যায় না। যখন অদৃষ্ট ভাঙ্গিবার সময় হয়—তখন কোন্ দিক দিয়া যে কেমন করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইয়া যায়—হাজার চেষ্টা করিলেও তাহা রক্ষা করিতে পারা যায় না; আবার যখন অদৃষ্ট গঠনের সময় হয়—তখনও বুঝিতে পারা যায় না—কেমন করিয়া এরূপ হইল, এত ঐশ্বর্য্য কেমন করিয়া সংগ্রহ হইল—সংগ্রাহক নিজেই তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় না; মানুষ চেষ্টা করিয়া কি জীবনে এত অর্থ, এমন মান সম্ভ্রম উপার্জ্জন করিতে পারে?

পান্নালাল গুড়ের বায়না করিয়া আসিয়া অবধি সে চিন্তা আর মনোমধ্যে স্থান দেন নাই, কারণ যাঁহার জন্য করিয়াছিলেন—তিনি পীড়িত; এ সময় অর্থের চিন্তায় ফেলিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করা যায় না ত? কিন্তু গুড় আটক করিয়া গিয়াছেন, মহাজন কড়ারের দিন বহির্ভূত না হইলে ত আর কাহাকেও তাহা হস্তান্তর করিতে পারে না। এদিকে সহরের দোকানে গুড়ের বড়ই অভাব পড়িয়া গেল; পাইকারগণ দলে-দলে আসিয়া মহাজনকে গুড় ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল কিন্তু মহাজন কিছুতেই ধর্ম্মনষ্ট করিল না—গুড় ছাড়িল না। পাইকারগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া **পান্নালালের** ঠিকানায় ছুটিল; এই টানের সময় যে অগ্রে বাজারে গুড় লইয়া যাইতে পারিবে—সেই অজস্র টাকা লাভবান হইবে—এই আশার আশ্বাসে তাহারা **শিবপুরের** ঠিকানায় **পান্নালালের** সহিত দেখা করিয়া সহরের অভাব জানাইল।

পান্নালাল বলিলেন—"এখনও দিন আছে; আমার অংশীদার পীড়িত, তিনি আরোগ্যলাভ না করিলে—ইহার প্রতিকার হইতে পারে না।

পান্নালালের অবস্থা দেখিয়া পাইকারগণ মনে-মনে হাসিতে লাগিল। এরূপ ধর্ম্মকর্ম্মে পটু ব্রাহ্মণ কখন কি ব্যবসা করিতে পারে? যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে ইনি কোন খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া এ কাজ করিয়াছেন; ইহার অংশীদার কিরূপ ধনী, তাঁহার সহিত দেখা হইবার উপায় নাই। এক্ষণে যদি অপর মোকাম হইতে বেশী কিস্তি আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে লাভের সম্ভাবনা অতি-অল্প, এখন বাজারে গুড় বিক্রয় করিতে পারিলে, যেরূপ টান পড়িয়াছে, চারিদিকে যেরূপ অভাব হইয়াছে, তাহাতে কুড়ি-পঁচিশহাজার মণ গুড় একমাসের মধ্যে ছয় টাকা করিয়া বিক্রয় করিলে, বহু অর্থলাভ হইতে পারে।

পাইকারগণ আর কোন কথা না কহিয়া, মণপ্রতি একটাকা মুনফা দিয়া, **পান্নালালের** নিকট হইতে ছাড়পত্র লিখিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। পিতার বিষয় নষ্ট হইবার পর, **পান্নালাল** এতগুলি টাকা একত্র আর কখন দেখেন নাই;—পঁচিশহাজার ত সহজ টাকা নয়! তাই বলিতেছিলাম,—পুরুষের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন কোন দুর্লক্ষ্য সূত্র ধরিয়া, যে পরিবর্ত্তিত হয়—কুয়াশাচ্ছন্ন অদৃষ্টগগন কিরূপ সৌভাগ্য-সূর্য্যের কিরণমালায় সমুজ্জ্বলভাব ধারণ করে, তাহা কে বলিতে পারে? করুণাময়ী বিশ্বজননী বিশ্বের মাঝে মানুষকে কখন কিরূপ ভাবে পার্থিব উন্নতির চরমে তুলিয়া, অযাচিত মানসম্ভ্রমে

বিমণ্ডিত করেন—তাহা অন্ধ মানব বুঝিতে পারে না বলিয়াই—এই মায়ার সংসারে বৈষ্ণবী-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অনবরত হা—হা করিয়া মরে, জীবনে কিছুই হইল না বলিয়া, হতাশ-হৃদয়ে সরস-জীবনকে মরুভূমির ন্যায় নীরস করিয়া তুলে—কিন্তু বুঝে না, মায়ার কৃপা হইলে, কটাক্ষে অসম্ভব সম্ভব হওয়ার বিচিত্রতা কিছুই নাই। অঘটন-ঘটনপটীয়সী **মহামায়া** দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না ত্রিজগতে এমন কি কাজ আছে?

মানব! ধর্ম্মপথগামী হও, সত্য বজায় রাখ, দেখ দেখি তোমার জীবন-পথ কেমন মধুময় হয়—কেমন অনায়াসে, নিশ্চিন্তে **পান্নালালের** মত আজীবন সুখে দুঃখে অধীর না হইয়া, হেলায় জীবন-সংগ্রামে বিজয়-লাভ করিতে পারে, বিশ্বাস কর—দিবার কর্ত্রী মা আছেন—পাইবার উপযুক্ত হইলে, কোথা হইতে যে তোমার অভাব পূরণ হইবে, তাহা তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে স্থির করিতে পারিবে না; এ সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া কাহারও সাধ্য নয়! উপযুক্ত হওয়া তোমার কাজ; উপযুক্ত হইবার চেষ্টা কর, কাজ কর, কর্ম্ম-রূপিণী মা কর্ম্মের জন্য সকলকে সমান ভাবে আহ্বান করিতেছেন—তাঁহার কথা শুন।

অনায়াসে আশাতীত অর্থলাভ করিয়া, **পান্নালাল** আনন্দে অধীর হইলেন না। আবার সংসারের কাজ তাঁহার স্কন্ধে চাপিল, বুঝিয়া ক্ষণেকের জন্য সামান্য ক্ষুণ্ণ হইলেন, তার পর মায়ের দান, আশীর্ব্বাদস্বরূপে তাঁহারই উপর বর্ষিত হইয়াছে ভাবিয়া, পরম পুলকিতচিত্তে শির পাতিয়া গ্রহণ করিলেন।

যদুপতি সমস্ত শুনিলেন। তিনি যাহার জন্য আশা করিয়া এতদিন নৈরাশ্য-সাগরে ডুবিতেছিলেন, পান্নালালের ন্যায় ধার্ম্মিকের দৈন-দুর্দ্দশা ঘুচিল না, মনে করিয়া তিনি ধর্ম্মলোপের সম্ভাবনা মনে করিতেছিলেন—আজ তাঁহার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে শুনিয়া, ভগবানকে হৃদয়ের সহস্র ভক্তি-কুসুম উপহার দিলেন। সেইদিন হইতে যদুপতি আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মিলনে মহত্ব

পূর্ব্বে বলিয়াছি—অদৃষ্ট যখন মন্দ হয়—তখন যেমন চারিদিকেই অমঙ্গল, চারিদিকেই বিপদ ঘুরিয়া বেড়ায়, কিছুতেই শুভ লাভ হয় না। যাহাতে ভাল হইবার সমস্ত সম্ভাবনা বর্ত্তমান—অদৃষ্ট মন্দ হইলে তাহা যেমন বিপরীত হইয়া পড়ে। আবার অদৃষ্ট যখন সুপ্রসন্ন হয়, কপালচক্র যখন বক্রগতি ছাড়িয়া সোজা দিকে চলিতে থাকে, তখন এ জগতে তাহার সবই সোজা, সবই সহজলভ্য হইয়া যায়—যাহা তাহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব ছিল, তাহাও তখন অবলীলাক্রমে সুপ্রসন্ন হইয়া যায়; অদৃষ্টচক্রের গতি, প্রাক্তনের ফল এমনি দুর্ব্বোধ্য!

পান্নালালের অদৃষ্টে যখন একটা বিপুল অর্থলাভ হইয়াছে, বিনা আয়াসে পার্থিব উন্নতির তরঙ্গ যখন একটানা

রহিয়াছে; তখন যে দিকে যাহা করিবেন—তাহাতেই সুখের মুখ দেখিতে পাইবেন। ফলে তাঁহার পক্ষে তাহাই হইল। গুড়ের বাণিজ্য হইতে ভগবান যে মূলধন দিয়াছেন; তাহা হইতেই চারিদিকে সুরাহা হইতেছে—চঞ্চলা অচলা হইয়া তাহাতেই অধিষ্ঠিতা হইতেছেন, একটীতেও কুফল ফলিতেছে না। **যদুপতি** আরোগ্য হইয়া, এই ছয় বৎসর তাঁহার সহিত সকল বাণিজ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দিয়াছেন। **যদুপতি** পরোপকারী লোক, তাঁহার কোনপ্রকার অভাব না থাকিলেও **পান্নালালকে** প্রাণের সহিত ভালবাসেন বলিয়া, এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার কার্য্যে যুবকের ন্যায় পরিশ্রম করিতেছেন।

পাকা ছয় বৎসর কার্য্য করিয়া **পান্নালালকে** তিনি পুনরায় অশেষ সম্পত্তিশালী জমীদাররূপে দাঁড় করাইয়াছেন। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বহন করেন; তিনি **যদুপতি** রূপে **পান্নালালের** সহায় হইয়াছেন, তাই ধূলামুঠা ধরিতে এখন কড়িমুঠা হইতেছে। **পান্নালালের** কর্ম্ম-বিপাক কাটিয়া গিয়াছে; এখন অদৃষ্টগগনে সুখ-সূর্য্যের উদয় হইয়া তমসাচ্ছন্ন দিকচয় সুবিমল আলোকোজ্জ্বল করিয়াছে। **পান্নালাল** অতুল বিত্তবিভবের অধিকারী হইয়া দিক্‌ভ্রান্ত, অহঙ্কৃত হন নাই; চরিত্র ঠিক সমভাবেই উদার, ধর্ম্মপরায়ণ রাখিয়া মানব-প্রকৃতির মাধুর্য্য শতগুণে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন; পিতার মত তিনিও অভাব অভিযোগে মুক্তহস্ত; সদাব্রত করিতে অণুমাত্র কার্পণ্য করেন না; ধন উপার্জ্জন সকলেই করে, কিন্তু তাহার রসাস্বাদন করা কয়জনের

ভাগ্যে ঘটে, কয়জন তাহার সদ্ব্যয় করিতে পারে? ধর্ম্মপথগামী **পান্নালাল** বংশাবলীক্রমে তাহা শিখিয়াছিলেন—তাই আজ তাঁহার জমীদারীর মধ্যে প্রজাবর্গের দৈন্য দূর হইয়াছে; কাহারও কষ্টের লেশমাত্র নাই, হইবার সম্ভাবনা হইলে মহানুভব জমীদারকে জ্ঞাত করিবামাত্রই তাহার প্রতিকার হয়; এ হেন জমীদারের জমীদারীতে বাস করিয়া, কে না শতকণ্ঠে তাঁহার যশোগান করিবে?

পিতার ন্যায় **পান্নালালও** আবার সেইরূপ পুণ্যের সংসার পাতিয়াছেন; আবার আত্মীয়স্বজন—সম্বন্ধের সম্বন্ধীয় জনসকলে আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে; **বগলাচরণ** আসিয়া আবার জমীদারী তত্ত্বাবধারণের ভার লইয়াছেন, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সকল হইয়াছে, জ্যোতিষীরকথা বর্ণে-বর্ণে সত্য হইয়াছে, মাতৃসমা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর দুর্দ্দৈব তিরোহিত হইয়াছে দেখিয়া, জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা-স্থাপন হইয়াছে; কায়মনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া, তিনিও পূর্ব্বের ন্যায় নিজের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ **স্বরূপ ঘোষ** আবার আসিয়া সরকারের পদ গ্রহণ করিল; খরচপত্রের এবং হিসাবনিকাশের ভার তাহার উপর পূর্ব্বের ন্যায় ন্যস্ত থাকিল; সে এখন অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, সঙ্গে একজন সাহায্যকারীও রক্ষিত হইল। **নিতাই পাইক** প্রভুকে ছাড়িয়া বেশীদিন থাকিতে পারে নাই; ছাড়িয়া যাইবার এক বৎসর পরেই বিনামাহিনায় আসিয়া, প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। **নিতাই** এখন চাকর নহে, সে পোষ্যবর্গের মধ্যে একজন,

এ সংসারে তাহার কর্ত্তৃত্ব অনেক খাটে; সে যাহা বলে, যাহার জন্য অনুরোধ ধরে, একান্ত অসঙ্গত এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ না হইলে পান্নালাল ও শিবানীর নিকট তাহা ব্যর্থ হয় না—অবিচারিতচিত্তে নিতাইয়ের সে আবদার রক্ষিত হয়—এইজন্য অনেক দুঃখী-ব্রাহ্মণকে সে জমীদারীরমধ্যে নিষ্করে বাস করিবার হুকুম তামিল করিয়া দিয়াছে।

চণ্ডালপুত্র নিতাইয়ের এইরূপ পরোপকার ধর্ম্মমূলক অনুরোধ ছাড়া নিজের স্বার্থের জন্য সে কখন প্রভু ও প্রভু-পত্নীকে বিরক্ত করে নাই; সে যেমন গরীব, তেমনি গরীবের মত থাকিত। শিবানী তাহাকে তদবস্থায় থাকিতে দেখিয়া সময়ে-সময়ে কত বকিতেন—দুঃখ করিয়া দুই-চার কথা শুনাইয়াও দিতেন, তাহাতে নিতাই বলিত—মা! নিজের অপেক্ষা পরের জন্য কাজ করলে আমার বড় আমোদ হয়—তোরা যখন আমার আছিস, আর যখন আমার কেহইনাই, তখন তোরা আমার, আমি তোদের—ইচ্ছা করিলেই ওসব করিতে পারি, তা এখন আর বুড়োবয়সে কোন সখ হয় না। নিতাইয়ের এইরূপ মতি-গতি হইলেও শিবানী তাহাকে দুইগাছি রূপার অনন্ত গড়াইয়া দিয়াছেন—নিতাই তাহাই অঙ্গে পরিয়া অশেষ আনন্দ প্রকাশ করিত।

এ সংসারে নিতাই না করিয়াছে কি? যাহা করিয়াছে, স্বার্থপর জগতে মানুষ তাহা করিতে পারে না। সে আত্মবিক্রয় করিয়া প্রভুর নিকট ক্রীতদাস হইয়া আছে; প্রভু ও প্রভু-পত্নীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিতাই সব করিতে পারে, এমন কি বিষ্ঠা

পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিতে, সে অনুমাত্র ঘৃণা বোধ করে না, এমন প্রাণ দিয়া পরের জন্য কাজ করা, পরকে আপনার করিয়া লওয়া; ছোটলোক **নিতাই** যাহা করিয়াছে, অনেক ভদ্রলোকের মধ্যে এ আদর্শ মিলে না; পাঠক! তারপর সে কি করিয়াছে জানেন— হিমালয়ের পাদদেশ হইতে চারিদিন অনাহারে, অজ্ঞান, অচৈতন্য অবস্থায় **চুণীকে** কাঁদে করিয়া তুলিয়া আনিয়াছে।

দুষ্টা সরস্বতী যে **চুণীর** স্কন্ধ হইতে নামিয়াছিল; তাহার যে সুমতি হইয়াছিল, পাপের দংশন অসহ্য হওয়ায়, সে যে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া গুরুর অন্বেষণে শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা-জীবনে জীবন বিসর্জ্জন করিতে গিয়াছিল, এ কথা আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি।

যমুনায় আত্মবিসর্জ্জন দিবার পর **দয়ানন্দও** তাহার সহিত জলে পড়িয়াছিলেন—অচৈতন্যাবস্থায় উদ্ধার করিয়া একটী শিষ্যের আবাসে তাহাকে আরোগ্য হইবার জন্য রাখিয়া যান, শিষ্যটী বহু চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে আরাম করে, এবং তাহার অনুরোধে হিমালয়ের পাদদেশে **অবধূতের** তপোবন দর্শনে পাপমুক্ত হইতে গমন করে, কিন্তু প্রভু তথায় না থাকায়—হতাশ-হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইয়া এবং অনাহার ও অনিদ্রায় বহুকষ্ট পাইয়া ননীর-পুতলী **চুণীলাল** পুনরায় কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যেদিন তাহার রোগ-যন্ত্রণার ভীষণতা বৃদ্ধি হইয়াছিল; **নিতাই** বহু অনুসন্ধানের পর সেইদিনই বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া গুরুর আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিল এবং **চুণীকে** মৃতকল্প দেখিয়া সে স্কন্ধে করিয়া তথা হইতে হরিদ্বারে আনিয়া যৎসামান্য চিকিৎসা করায়। একজন সাধু

তাহাকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করেন; চৈতন্যোদয় হইলে চুণী নিতাইকে চিনিতে পারিল। অশেষপ্রকারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বলিল, "নিতাই! তুমি কেন এই পাষণ্ডকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইলে? এ ধরাতল হইতে আমার মত নারকীর নাম যত শীঘ্র লোপ হয়—ততই মঙ্গল; দাদার মত নিষ্কলঙ্ক চরিত্র মহাপুরুষ আদর্শরূপে জগতে বিদ্যমান থাকিয়া ধরার মুখোজ্জ্বল করুন, আমার মত কলঙ্কী কুল-পাংশুল পুত্রের জীবিত থাকিয়া ফল কি?" অনুতাপ প্রবল হইয়াছে দেখিয়া, নিতাই সান্ত্বনাচ্ছলে বলিল, "ছোট বাবু! মায়ের রাজত্বে ভালোর যেমন দরকার, মন্দেরও তেমন দরকার—মন্দ না হইলে, ভালোর ভাল ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে না; ভাল ত ভাল আছে, মন্দ ভাল হইলে কিন্তু জগতের কাজ অতুলনীয় রূপে সংসাধিত হয়; চল এখন ঘরে যাই—বড় বাবু ও বৌ-মা বড়ই বিব্রত হইয়াছেন। এমন দিন নাই, যেদিন তাঁহারা তোমার জন্য কাঁদিয়া ধরাতল অভিষিক্ত না করেন। আমি বৎসরাবধি অন্বেষণ করিয়া আজ তোমার ধরা পাইয়াছি, দ্বিধা করিও না—চল।

পূর্ব্বস্মৃতি সমস্ত চুণীর হৃদয়ে নূতনভাবে জাগিয়া উঠিল—মর্ম্মস্থল কি এক তীব্র-তাড়নায় ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল—সে সজোরে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল,—"নিতাই! সে দেব-দেবীর নিকট এ-কালামুখ কেমন করিয়া দেখাইব।"

নিতাই। তোমার এখন অনুতাপ আসিয়াছে—তাই নিজেকে কালামুখ দেখিতেছ, কিন্তু তাঁহারা তোমার এত অত্যাচারেও তোমাকে সু-মুখ দেখিতেছেন, একদিনের জন্যও অভিশাপ দেন

নাই, বরং তোমাকে পাইবার জন্য সদাসর্ব্বদা এই বলিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, যে হে ভগবান! চুণীর মতিগতির পরিবর্ত্তন কর, তাহাকে আবার আমাদের সহিত মিলাইয়া দিয়া, সংসারের শ্রীবৃদ্ধি কর। এই প্রার্থনা এখন তাঁহাদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে হইয়াছে।

চুণী এই সকল কথা শুনিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া, বলিলেন,—ওঃ—'দাদা—দাদা! বৌ-দিদি! তোমরা যে, আমার বাপ, মায়ের আমি কি নরাধম যে এ হেন দেব-দেবীকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়াছি। হায় নিতাই আমার ন্যায় পাপী এজগতে আর কে আছে? এই বলিয়া চুণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

নিতাই ভাব দেখিয়া, পাপের তীব্র-তাড়না দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, শশব্যস্তে তাহার শুশ্রূষা করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিল, বহুদিন অনাহারে দুর্ব্বলতা বাড়িয়াছে, আর বিলম্ব করা উচিত নয় ভাবিয়া সে বলিল, "ছোটবাবু! তোমাকে আর এখানে রাখিতে পারিনা, তুমি বড়ই দুর্ব্বল; এখানে খাদ্যাদি ভাল নাই, অর্থেরও অভাব, চল তোমাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাই। চুণীর চলিবার বিন্দুমাত্র শক্তি না থাকিলেও তথাপি তিনি স্কন্ধে উঠিতে চাহিলেন না, ভীম বিক্রম নিতাই কিন্তু ছাড়িল না, আজ অনবরত দুই মাস তাহাকে স্কন্ধে করিয়া, এই কয়েকদিন হইল শিবপুরে আসিয়াছে।

পান্নালাল গুড়ের কিস্তির বায়না করিয়া অনেক টাকা পাইয়াছেন, শুনিয়া নিতাই আনন্দিত মনে ছোটবাবুর অন্বেষণে চলিয়া

গিয়াছিল। এত উন্নতি সে দেখিয়া যায় নাই। আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে অবিশ্বাস করিতে পারিল না—যে ধার্ম্মিককে সত্যসত্যই ভগবান রক্ষা করেন, তাহার কর্ম্মের যথার্থ পুরস্কার দেন। যদিও প্রথমে অমানুষিক কষ্ট হয় বটে, কিন্তু পরিণামে বিমল-আনন্দ ভোগ যে অনিবার্য্য, তাহা পরহিতব্রত নিতাইয়ের মনে দৃঢ় ধারণা হইল। এই কয় বৎসরের মধ্যে বড়-বড় অট্টালিকা নির্ম্মাণ হইয়াছে, কর্ত্তা-বাবুর মত আবার বৃহৎ সংসার উজ্জ্বল হইয়াছে, টাকাকড়ির অজস্র আমদানী হইতেছে, জমীদারীর লোকজনে গৃহপ্রাঙ্গণ ভরিয়া গিয়াছে, কলকণ্ঠে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, পান্না-লালের শিবানী আবার শিবরাণীর মত রাজরাণী হইয়াছেন। নিতাই ছোটবাবুকে আনিয়া পান্নালালকে প্রণাম করিল, তাহার গালভরা হাসি দেখিয়া পান্নালাল বলিলেন, "নিতাই! এ তোমার মত পবিত্র-হৃদয়-ভৃত্যের আনুগত্য জন্যই হইয়াছে, এবং এ উন্নতির মূল তোমার পিতা-মাতার কল্যাণ কামনা বর্ত্তমান রহিল জানিবে। বলিয়া পান্নালাল অকপট হৃদয়ে ছোট ভাইকে বুকে করিলেন, স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। চুণী দাদার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না, কেবল কাঁদিতে লাগিল, কোন কথা কয় না, কেবল কান্না, দুনয়নে জলস্রোত প্রবল বন্যার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া বুক ভাসিতে লাগিল, যে কোন কথাই জিজ্ঞাসা কর, চুণী কোন কথাই বলিতে পারে না, তাহার বাক্য বুঝি রোধ হইয়া গিয়াছে। নিতাই ছোট বাবুকে পান্নালালের কাছে দিয়া যখন অন্দরে শিবা-

নীর সহিত দেখা করিতে গেল, তখন শিবাণী অতি নম্র-ভাবে অথচ শশব্যস্তে আসিয়া তাহার নিকট বিনয়ের একগাল হাসি হাসিয়া বলিল, "বাবা, এসেছ, ভাল আছ, আমার হাতে গড়া মানুষকরা ধনটীকে এনেছ কি?"

নিতাই উর্দ্ধে চাহিয়া বলিল, "হা মা! "তাঁহার কৃপায় বহুকষ্টে এনেছি বটে, কিন্তু মৃতকল্প, বহুদিন সেবা করিলে তবে পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন, তিনি বড় বাবুর নিকট পায়ের তলায় বসিয়া কেবল কাঁদছেন, কথা কইতে পারেন না।"

শিবানীর প্রাণ উথলিয়া উঠিল, তিনি সজলনয়নে বলিলেন, "নিতাই! তাকে বাহিরে রেখে এলি কেন? এরূপ অবস্থায় সে কি এখন বাহিরে থাকিতে পারে।" এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় অশক্ত চুনীকে বাহুবেষ্টন করিয়া পান্নালাল অন্দরে প্রবেশ করিলেন। চুনী দাঁড়াইতে অশক্ত তথাপি বৌ-দিদিকে সম্মুখে দেখিয়া যেন আত্মহারা হইয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিলেন, "দেবতার ক্ষমা পেয়েছি, দেবী আমার, মা আমার, তুমি ক্ষমা করিবে নাকি?" বলিয়া সে যেমন তাহার পদতলে পড়িল, অর্দ্ধ-চৈতন্য রহিত হইয়া গেল। সকলেই শশব্যস্তে তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

শিবানী কাঁদিতে-কাঁদিতে পুত্রসম দেবরকে কোলে তুলিয়া বলিলেন,—বংশের দুলাল, কে তোমার অপরাধ লইয়াছে, কেন তুমি কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছ, তুমি যে আমাদের হাতের গড়া মানুষ করা ধন, অপরাধ হইলেও তাহাত প্রাণে লাগে নাই।

প্রভায় ছেলেমানুষী অপরাধের মত তাহা তৎক্ষণাৎ আমরা ক্ষমা করিয়া, ভগবানের কাছে তোমার মঙ্গলকামনা করিয়াছি।

ভানুমতী দেবী এতক্ষণ কাছে আসেন নাই; তিনি ও তাঁহার পতি আবার এই সংসারভুক্ত হইয়াছেন, দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া এতক্ষণ ননদীর প্রশস্ত হৃদয়ের প্রত্যেক স্বর উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিতেছিলেন, তাহা কিসে নির্ম্মিত—কি পবিত্র উপাদানে এ হৃদয় গঠিত হইয়াছে, রক্তমাংসের শরীরে কি এত কোমলতা, এত মধুরতা, এত দয়া, এত মায়া থাকিতে পারে? কিন্তু কাকে রাখিয়া কাকে দেখা যায়, এর দুইটাই যে এক রকম, স্বামী-স্ত্রী এক কাঁটায় ওজন করিলে কোনটীও কম-বেশী হইবে না, মরি মরি বিধাতার নির্ম্মাণকারিকরীর কি বাহাদুরী, আর তাঁর মিলনকেও শত ধন্যবাদ, এমন দেবতার এরূপ দেবী না হইলে কি সাজে?

ভানুমতী আর থাকিতে পারিলেন না, নিকটে আসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু চৈতন্য সম্পাদন হইতে বড়ই বিলম্ব হইতে লাগিল; চুনী একবার চক্ষু চাহিতেছে, আবার পরক্ষণে কেমন করিয়া অচেতন হইয়া পড়িতেছে, অবস্থা দেখিয়া পতি-পত্নীতে কাঁদিয়া আকুল হইলেন, ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—প্রভু! হারানিধি যদি মিলাইয়া দিলে, তবে এমন অবস্থা করিয়া দিলে কেন? দাও প্রভু! চুনীকে আরোগ্য করিয়া দাও, আমরা যে তোমার চরণে চিরবিক্রীত, তবে এমন পরীক্ষা কেন ঠাকুর! ক্ষণে-ক্ষণে চৈতন্য সঞ্চার ও ক্ষণে-ক্ষণে লোপ হইতেছে

দেখিয়া, যদুপতি ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। বড়-বাড়ীতে ডাক্তারের অভাব কি? পানু বাবুর ভ্রাতার পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র নিকটবর্ত্তী নামজাদা ডাক্তার ও কবিরাজগণ আসিয়া উপস্থিত হইল, সকলেই পরীক্ষা করিয়া একবাক্যে, বলিল, "অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহার উপর মস্তিষ্কের উত্তেজনা খুব বেশী, অনাহারে, অনিদ্রায় রক্তের ভাগ অল্প, তাহাও মস্তকে নীত হইয়াছে, যাহা হউক চিন্তা নাই; গৃহের মধ্যে লইয়া যান, ভাল আহার দিন, বাতাস করুন, আর এই বলকারক ঔষধটী সেবন করিতে দিন।" বলিয়া চিকিৎসকগণ ব্যবস্থা দানান্তে দর্শনী লইয়া প্রস্থান করিল।

সেই দিন হইতে আজ পনরদিবস হইল;—চুণীর অবস্থা একইরূপ, কিয়ৎক্ষণ ভাল থাকে, চক্ষু মেলিয়া চায়, কিয়ৎক্ষণ পরে আবার দন্ত কিড়িমিড়ি করিয়া চৈতন্য লোপ হইয়া যায়, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে, অতিশয় দুর্ব্বলতাই যে এ রোগের কারণ, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। চুণী এখন বসিতে পারে না, ধরিয়া বসাইয়া দিলে কেবল কাঁপিতে থাকে, কথা কহে না, কেবল অনবরত চক্ষের জল গড়াইয়া বুক ভাসিয়া যায়, পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া চুণীকে ঘোর যাতনা দিতেছে, এখন জ্ঞান হইয়াছে, তাই দারুণ অনুতাপানলে সে দগ্ধ হইতেছে। যখন জ্ঞান হইবে, আমি কি করিয়াছি, চিত্তে যখন এই ভাব জাগিয়া উঠিবে, তখনই তীব্র অনুতাপ আসিয়া, তাহার সমস্ত পাপ—মলিনতা দগ্ধ করিয়া দিবে, অনুতাপ-অশ্রুজলে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া পাপী পরম শান্তি অনুভব করিবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

চুনীর কর্ত্তৃত্ব

ছয় মাসকাল পতি-পত্নীর প্রাণান্তকর সেবা-শুশ্রূষার ফলে কনিষ্ঠ চুনীলাল বেশ সুস্থ হইয়াছেন, পান্নালাল ও শিবা-নীর প্রাণে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। এতদিন তাঁহাদের হৃদয়টা যেমন ফাঁক-ফাঁক ঠেকিতেছিল, আজ পূর্ণরূপে তথায় আনন্দ বিরাজ করিতেছে, দুইশক্তি একত্র মিলিলে যেমন একটা দৃঢ়তা, একটা স্থিরতা বাড়িয়া উঠে, আজ পান্নালালের সেই ভাব, ভাইয়ের সাহায্য যে বড় প্রবল সাহায্য, জগতে এরূপ একতার সাহায্য সুদুর্লভ, যেখানে যথার্থ সংঘটন হইয়াছে, সেইখানেই যে অঘটন ঘটিয়াছে, অসাধ্য সাধন হইয়াছে।

কঠিনধাতু অগ্নিদগ্ধ হইলে সে যেমন কোমল হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না, অনুতাপানলে পুড়িয়া-পুড়িয়া চুনীলালের কঠিন হৃদয়ের অবস্থাও ঠিক তাই হইয়াছে, যে দেখিতেছে সেই বলিতেছে,—যে প্রস্তরবৎ কঠিন পাপীষ্ঠ চুনী কেমন করিয়া এমন কোমল হইল, বিধাতঃ! বলিহারী যাই তোমার লীলা খেলায়, কখন কাহাকে কিরূপ ভাবে কোন পথ দিয়া তোমার নিজের পথে, মানবজীবনের চির-আকাঙ্ক্ষিত পথে আনয়ন কর, তাহা তুমিই জান? চুনী এখন ধার্ম্মিকচূড়ামণি হইয়াছে, প্রাণ কোমলতায় মাখা হইয়াছে, হৃদয় দয়ার আধার হইয়াছে, বংশের পবিত্রতায় মাখামাখী হইয়া তাহাকে

সম্পূর্ণ দেবভাবের পরিস্ফুরণ হইয়াছে। **দয়ানন্দ-অবধূত** যমুনা হইতে তুলিয়া তাহার প্রাণে যে কি মধু ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই সমস্ত মধুময়, অমৃতময় হইয়া গিয়াছে। **পান্নালাল** নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, পুনরায় বিষয়-বৈভবের সমাবেশ হওয়ায় ধর্ম্মকর্ম্মে অনেক বিঘ্ন হইবে মনে করিয়া, **পান্নালাল** বড়ই ভাবিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে উপযুক্ত ভ্রাতাকে পাইয়া, তাঁহার অপেক্ষাও ভাল ভাবে তাহাকে গঠিত হইতে দেখিয়া—সমস্ত ভার ভ্রাতার উপর প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

এবার সকলেই একবাক্যে বলিল, "ঠিক হইয়াছে, **চুণী** যে ভাবে ফিরিয়াছে; তাহাতে আর পতনের সম্ভাবনা নাই, পিতল সোণা হইয়াছে, কষিত-কাঞ্চন কি আর কখন মলিন হয়?" **চুণীবাবু** কিন্তু ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, কোন কাজ করেন না, **চুণীর** সেই ভাবগতিক দেখিয়া **পান্নালাল** কিন্তু অভিমান ভরে বলেন—ভাই! আর কেন," তোমার সংসার তুমি দেখিয়া—শুনিয়া লও, আমী ত বৃদ্ধ হইয়াছি, আমাকে আর কেন বিরক্ত কর?

চুণী অতি বিনীতভাবে বলিতেন, "এ যে তোমারই সত্যগুণে, ধর্ম্মময় জীবনে উপার্জ্জিত হইয়াছে, দাদা! ইহাতে আমার হাত পড়িলে পাছে নষ্ট হয়, এই জন্য।

পান্নালাল স্নেহময় প্রাণে কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "যতদিন তোমাতে তুমি ছিলেনা, দেবতার বংশধর যতদিন দেবত্ব হারাইয়াছিল, ততদিন আমি করিয়াছি বটে, এখন তুমি দেবত্ব

ফিরিয়া পাইয়াছ, এখন দেবভাবে সমস্ত গড়িয়া, আবার মায়ার-খেলা খেলিতে তোমার সমস্ত অধিকার বর্জ্জিত হইয়াছে, এখন আমি আর তুমি প্রভেদ কি ভাই ?”

চুণী। দাদা! আকাশ-পাতাল, চন্দনে-বিষ্ঠাতে যত প্রভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে যত বর্ণগত প্রভেদ, তোমাতে আমাতে সেইরূপ, বিষ্ঠাভোজী কুকুর কখন এত শীঘ্র দেবতার আসন গ্রহণ করিতে পারে না, দাদা! তুমি এত শীঘ্র আমার উপর সমস্ত নির্ভর করিলে কি জানি যদি পদস্খলন হয় ?

পান্নালাল ভ্রাতার বিবেক-বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে টানিয়া বলিলেন, “ভাই! আত্মগ্লানী করিয়া আর কেন আত্মঘাতী হোস্, তোর প্রতি মহামায়া সদয় হইয়াছেন, আর চিন্তা কি ?”

শিবানী ও অন্যান্য পরিবারবর্গ দুই ভ্রাতার এইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ দেখিয়া গলিয়া যাইত, স্বর্গের ভাব যেন সংসারের প্রতি কেন্দ্রে-কেন্দ্রে সুষমা বিস্তার করিয়া সকলকে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিত।

এ সংসারে যদুপতি এখন প্রধান মন্ত্রী, পান্নালাল তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া ভ্রাতাকে সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতে বলিতেন,—আরও বলিতেন, এই মহাত্মা সপত্নীক সর্ব্বতোভাবে আমাদের উন্নতি কামনা না করিলে, আমাদের পুনরায় এরূপ সৌভাগ্যোদয় হইত না। চুণীলাল তাই যদুপতিকে পিতার মত মান্য করেন; তাঁহার ধর্ম্মশীলা পত্নীও এই সংসারের কর্ত্রী হইয়াছেন, যাবতীয় কাজ তাঁহারই হুকুমে পরিচালিত হয়, শিবানী স্বগৃহে

শাশুড়ীর মত তাহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। পূর্ব্বের মত সবই ঠিক হইয়াছে। সমস্তই ঠিকভাবে সজ্জিত হইয়াছে, পিতার আমলে যাহা ছিল, এখন তাই; তবে নিতাইয়ের আদর কিছু বাড়িয়াছে, তাহাকে গৃহকর্ম্ম কিছু করিতে হয় না, শিবানীর পুত্র কন্যাগণকে লইয়াই সে মায়ায় জড়িত; প্রভাও ছোট-ছোট শিশুগুলি নিতাই কাকাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারে না, তাহার স্নেহভালবাসা তাহাদের হাড়ে-হাড়ে জড়িত হইয়াছে, পিতা-মাতার অপেক্ষাও বেশী, তাঁহাদের কথায় যাহা হয় না, যাহা করে না, এই অপোগণ্ড শিশুগুলি নিতাই বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহা শুনে,—সেইমত কাজ করে। স্বরূপ ঘোষ এখন আর তত খাটে না, একজন সহকারী আছে, সেই সমস্ত করে, স্বরূপ খবরদারী করিয়াই ক্ষান্ত হয়। শিবানীর কনিষ্ঠ বগলাচরণের কাজে কোন প্রকার ত্রুটী নাই, তিনি খুব দক্ষতার সহিত কাজ করিতেছেন, এখন বিষয়-আশয় পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইলেও তাহার কাজে কোন প্রকার ঔদাস্য নাই। যখন চলে তখন কোথাও কোন গলদ থাকে না, স্থিরভাবে সমস্ত সমাহিত হয়, ইহা বিধাতার নিয়ম!

শিবপুরের উপকণ্ঠ হাট-বাজারের বড়ই অভাব, বহুদূর না যাইলে কোন দ্রব্যাদি পাওয়া যায় না, পান্নালালকে সকলেই এখানে একটা হাট বসাইবার জন্য অনুরোধ করিল। তিনি চূণী ও যদুপতির উপর ভার দিলেন, প্রজাবর্গের অভাব অভিযোগ দেখিতে বলিলেন। তাহারা এ বিষয় যুক্তি সঙ্গত

মনে করিয়া চাটুয্যের হাট নামে তাথায় একটী বিপনী সংস্থাপন করিলেন। পান্নালালের গুরুদত্ত নাম "সত্য কিঙ্কর" চাটুর্য্যের নামেই তাহা প্রতিষ্ঠিত হইল। লেখা হইল, মহাত্মা রতন চট্টোপাধ্যায়ের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখিবার জন্য তদীয় দাসানুদাস "সত্যকিঙ্কর" কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত, হইল। চুণী আর কিছুতেই নাম দিতে চাহিলেন না, তিনি এখন আর নামের কাঙ্গাল নহে, বোম্বেটেগিরি করিয়া তিনি যে নাম অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা এখন লোপ হইলেই বাঁচেন, আর নাম করা কিসের জন্য। পান্নালাল ও শিবানীর নিকট কিন্তু তাহার জন্য চুণী ভয়ানক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। হাটে ক্রমশঃ লোক সমাগম হইতে লাগিল; চাটুয্যের হাট পাইকারী হাট নামে চারিদিকে প্রসিদ্ধি লাভ. করিল। পান্নালালের সত্যকিঙ্কর নাম প্রচার করিবার নিমিত্ত ঘোষণা করা হইল, যাহার যে কোন দ্রব্য বিক্রয় না হইবে, তাহা জমীদার সরকারে প্রদান করিলে তাহার উচিত মূল্য প্রদান করা হইবে। এইরূপ প্রলোভনে অতি অল্পদিনের মধ্যে চাটুয্যের হাটে বেপারী, পসারীর সীমা রহিল না, দেশ-বিদেশ হইতে অসংখ্য ক্রেতা, বিক্রেতার জনতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

দেবীপুর গ্রামে দেবহৃদয় রতন ঠাকুরের নামে মন্দির নির্ম্মিত হইল। মহামায়া ও ভৈরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন, ভোগাদির বিশেষরূপে বন্দোবস্ত হইল। অতিথিশালা "রত্নশালা" নামে তথাকার দীন-দরিদ্রগণের অভাব মোচন করিতে লাগিল।

তখন অন্য যানাদির প্রচলন ছিলনা, তাই ইতস্ততঃ যাতায়াতের জন্য একটী হস্তি প্রতিপালিত হইতে লাগিল। শুনা যায় সত্যকিঙ্করের আমলে ঐ বন্য-পশুটীকে প্রত্যহ অর্দ্ধমণ মণ্ডা খাওয়ান হইত। সত্যকিঙ্কর গো-ব্রাহ্মণ সেবা করিতে এবং চুণী অন্য-সাধারণ জীবের সেবা করিতে মুক্তহস্ত হইয়া ছিলেন। হস্তীটীকে এইরূপ ভাবে প্রতিপালন করা চুণীর সক্, তাহার উপর আরোহণ করিয়া, জমিদারীর কার্য্য যত পরিদর্শন করা হউক আর নাই হউক, চুণী তাহার সাহায্যে নানাস্থানে গমন করিয়া দুস্থঃ আর্ত্তের সেবা করিতে যাইতেন, আবশ্যক হইলে উহার সাহায্যে তাহাদিগকে গৃহে আনিতেন, নানাপ্রকার সেবাশুশ্রূষা করিয়া ভাল হইলে তাহাদিগকে যথাস্থানে রাখিয়া আসিতেন। এই সকল কার্য্যে তিনি একাকী প্রাণপণ করিতেন না, ইহাতে তাঁহার বৌদিদিরও যোগ ছিল!

সত্যকিঙ্কর পান্নালাল বড়লোক হইয়াছেন, যথেষ্ট অর্থাগম হইয়াছে কিন্তু তিনি এ সকলে ক্রমশঃ যেন বীতশ্রদ্ধ হইতে লাগিলেন, যাহা করেন যদুপতি ও বগলাচরণ। একএকদিন কনিষ্ঠসহোদর চুণীকে ডাকিয়া পান্নালাল বিবাহ করিবার জন্য বিশেষ জেদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু চুণী দেবোপম ভ্রাতার পদধূলী লইয়া বলিলেন, "দাদা! আমি বেশ আছি, আর কেন শেষদশায় কাদা ঘাঁটাইবেন। বিবাহ করিতে হয় পুত্রের জন্য, পাছে পিতৃপুরুষের জল গণ্ডূষ লোপ হয়, এই জন্য বিবাহের প্রয়োজন, কিন্তু আমার ত সে আশঙ্কা নাই, তোমার

পুত্র কন্যা হইয়াছে, ভগবান উহাদিগকেই দীর্ঘজীবী করুন, তাহা হইলেই সমস্ত বজায় থাকিবে। কলির প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়াছে, দেখিয়া আমার আর বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই, আর কি বৌদিদির মত দেবীপ্রতিমা, গৃহলক্ষ্মী পাওয়া যাইবে যে বিবাহ করিয়া সুখী হইব, সে আশা আর নাই। আমাকে বিবাহ করিতে আর অনুরোধ করিবেন না, সেবাব্রতই আমি জীবনের সার করিয়াছি!"

নষ্ট-চরিত্র ব্যক্তি একবার ফিরিয়া পড়িলে, বিবেক-বুদ্ধির বলে একবারে সমস্ত বুঝিতে পারিলে সে এমন ধর্ম্মপথগামী হয়, এমন মহত্ব লাভ করে, যাহা আজীবন ধর্ম্মপথগামী জীবও লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য দস্যুরত্নাকর ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য মহাকবি বাল্মীকি হইয়াছিলেন পবিত্র রামায়ণ গানে ভারতের পুণ্যময় তপোবন মুখরিত করিয়াছিলেন, কত অনাথ-অতুরের জীবন দান করিয়াছিলেন, সে ত্রেতাযুগে, বহু পূর্ব্বের কথা, আর এখনকার চুণীন্দ্র চরিত্রে সেই ভাব সম্যক উপলব্ধি হইতেছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

উন্নতি চরম

যখন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়,—দৈবের কৃপা যখন পূর্ণ প্রভায় মানব অদৃষ্টে প্রতিফলিত হইতে থাকে, তখন কোন্‌দিক হইতে যে কিরূপ সৌভাগ্যের প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইতে থাকে তাহা স্থির করা যায় না।

কি কার্য্যে যে অর্থাগম হইতেছে, তাহা বুঝিয়া উঠা দায়। যেখানে অর্থাগমের কোন সম্ভাবনা নাই, অনেকে যাহাতে বহু অর্থ নষ্ট করিয়া চির-কষ্টকে আলিঙ্গন করিয়াছে,—ঘোরতর দরিদ্র হইয়া গিয়াছে; অদৃষ্ট-সুপ্রসন্ন-সময়ে তুমি তাহা হইতেই অজস্র অর্থলাভ করিতে পারিবে। ক্ষতি হওয়া দূরে থাক, উন্নতিই তোমার পদে পদে, এই জন্য বলিতে হয়, পুরুষকার দৈবসাপেক্ষ, দৈব সানুকুল হইলে তুমি যতই অকর্ম্মণ্য হও, যতই কেন অক্ষম হও, ভিতর হইতে কি একটা প্রবল শক্তি উত্তেজিত হইয়া, তোমাকে কর্ম্মে বলবান করিয়া তুলিবে, তখন তুমি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, তাহাতেই লাভবান হইবে, অর্থের প্রতুলতায় তুমি অসীম মানী-গুণী-জ্ঞানী হইয়া পড়িবে।

সত্যকিঙ্করের পান্নালালেরও আজ দৈব সেইরূপ ভাবে সানুকুল, নিজে কিছু করেন না, নির্লিপ্তভাবে সংসার করিবার তাঁহার ইচ্ছা, কেবল ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত, অথচ অর্থাগমের অভাব নাই। যদুপতি ও বগলাচরণের দ্বারা কার্য্য করাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন হইতেছে, কেবল মাত্র পঞ্চাশ সহস্র টাকায় কিস্তি কিনিবার সময় তিনি একবার ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, তারপর আর কোথাও যাইতে হয় নাই, অর্থের জন্য কোন বিষয় ভাল করিয়া চিন্তা করিতে হয় নাই, আপনাপনি কোথা হইতে রাশি-রাশি অর্থ আসিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে, সু-সময় হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। শিবপুরের উপকণ্ঠে হাট বসাইতে গিয়া, পূর্ব্বে কত লোক নিরাশ হইয়াছিল, কত-কত বড় ধনী ইহার জন্য অসীম

ধনক্ষয় করিয়া হৃতমান, গতধন হইয়াছিলেন কিন্তু পান্নালালের সত্যসন্ধতায় মা এত সন্তুষ্ট, কৃপাময়ী অধুনা তাঁহার প্রতি এত কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন যে বিনা আয়াসে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, বহু অর্থ সমাগম হইতে লাগিল, "চাতুর্য্যের হাট" খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

সত্যকিঙ্কর পান্নালাল যাহা ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন,—"অবিক্রীত দ্রব্য আনিয়া সরকারে প্রদান করিলে, তাহার যথাযথ মূল্য প্রদান করা যাইবে" এ ঘোষণা তিনি চিরদিন বলবৎ রাখিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার হাট জমিয়া উঠিতে বেশী বিলম্ব হইল না, সামান্য দিনের মধ্যেই হৈ—হৈ, রৈ—রৈ ব্যাপার, হাটে আর লোক ধরে না, নানা প্রকার দ্রব্যের বিকি-কিনি আরম্ভ হইল। চাতুর্য্যের হাটে যাহা না পাওয়া যাইবে, তাহা আর কোথাও পাওয়া যাইবে না, চারিদিকে এইরূপ রাষ্ট্র হইয়া গেল, সবই যেন ভূতে করিতে লাগিল। পান্নালাল ও শিবাণীর এত ধনাগম হইলেও সেই পূর্ব্বের ন্যায় চাল-চলন, ধরণ-ধারণ, কোন প্রকার মতিগতির বৈলক্ষণ্য হয় নাই, অর্থের জন্য তিল মাত্র অহঙ্কার তাঁহাদের দেবচরিত্রে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাঁহারা সেই মাটীর মানুষই আছেন, বরং অধীনস্থ জনগণের অপেক্ষাকৃত একটু চাল বিগড়াইয়াছে, সময়ে-সময়ে অহঙ্কার প্রদর্শন করিয়া কাহাকেও দুই-এককথা কহিয়া থাকে, কর্ত্তাগৃহিণীর কিন্তু সেই দীনতা, সেই অমায়িকতা, সেই সরলতা, পতিপত্নীকে দেখিলে দয়ার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত। আর চুণী তাহার

ত কথাই নাই—দুর্বৃত্ত ভাল হইলে যাহা হয়, মতিচ্ছন্ন মতিমান হইলে, ঘোর অন্ধকারের পর আলোক পাত হইলে সে আলোকের যেমন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, চুণীরও সেইরূপ হইয়াছে; সামান্য একটু বিবেকরশ্মিতে অতবড় একটা আঁধার ঘর জ্যোতির্ম্ময় করিয়া ফেলিয়াছে। এ আলো জ্যোতির্ম্ময় অথচ স্নিগ্ধ, দিক্‌দাহী অথচ কমনীয়; যাহার উপর একবার পতিত হয়, সেই উদ্ধার হইয়া যায়।

ত্যাগই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, সঞ্চয় ধর্ম্ম নহে; সঞ্চয় করা ব্রাহ্মণের অকর্ত্তব্য, তাই পান্নালাল অশেষবিধ সৎকর্ম্মে ধন ব্যয় করিতেন; অভাব-অভিযোগে পান্নালাল বা চুণীলালকে জানাইলে কাহাকেও রিক্তহস্তে ফিরিতে হইত না। রমণী-মহলেও সেইরূপ মা অন্নপূর্ণা-স্বরূপিণী শিবানীর রাজত্ব বিস্তৃত, অভাব সেখানে স্থান পাইতে পারে না।

যত বেশী ধনবৃদ্ধি হইতে লাগিল, মান-সম্ভ্রম যত বাড়িতে লাগিল, পান্নালাল তত উল্লাসিত না হইয়া, বরং ম্রিয়মান হইতে লাগিলেন; তাঁহার যেন এত উন্নতি, জাগতিক এত সৌভাগ্য-সম্পদ যেন ভাল লাগিল না। ধর্ম্মকর্ম্মে অনেক সময়ে বিঘ্ন হইতে লাগিল বলিয়া, তিনি বড়ই মনমরা হইয়া পড়িতে লাগিলেন, নিজের দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ যদুপতিকে আর কার্য্য বাড়াইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু সময়ের স্রোতে বাধা দিবে কে? তখন দুই-একজন সাহেব সওদাগর সত্যকিঙ্করের নাম শুনিয়া, তাঁহার সাহায্যে কারবার চালাইতে মনস্থ করিল,

তাঁহাকে মুৎসুদ্দি করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে টাকা লইয়া কারবার করিতে লাগিল।

যদুপতি ও বগলাচরণ চুণীলালকে লইয়া তাহাদের পরিচালনা করিতে লাগিলেন। পান্নালাল ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না, জানিলে এ কাজে হস্তক্ষেপ করিতে তিনি নিষেধ করিতেন। চুণীলাল বহুদিন সাহেবদিগের সহিত মেশামিশী করিয়াছেন, যদুপতির অনুরোধে তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন বটে কিন্তু মনে-প্রাণে লাগিতে পারিলেন না, যাহার মন পরমার্থতত্ত্বে একবার ডুবিয়াছে, সে কি আর বৈষয়িক কাজে সেরূপ দৃঢ়ভাবে মনোনিবেশ করিতে পারে? চুণী লাল দুইদিন যান, চারিদিন যান না, এইজন্য কাজকর্ম্মে বড়ই গোলযোগ হইতে লাগিল, যদুপতি বৃদ্ধবয়সে অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িলেন। বগলাচরণ একাকী কি করিবেন, কর্ম্মচারীবর্গ মনীবগণের এরূপ অমনোযোগ দেখিয়া " আপনাদের দারুণ স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতে লাগিল। কাজেকাজেই অল্পদিনের মধ্যে দুই-একটী অফিস দেনার দায়ে জড়িত হইয়া পড়িল। মহাজনগণ সত্যকিঙ্করের অফিস বলিয়া দ্রব্যাদি দিয়াছিল, সাহেব-সুবাকে তাহারা জানে না, কাজেই সমস্ত দেনা, তাঁহারই স্কন্ধে আসিয়া পড়িল।

ইহাই হইল, পান্নালালের অবনতির প্রথম সূত্রপাত, আরও—প্রবাদ একদিন হাটে একটী স্ত্রীলোক একটী অলক্ষ্মী গড়িয়া বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল, সমস্ত দিন হাটে বসিয়া তাহার অলক্ষ্মী-

প্রতিমা বিক্রয় হইল না, অলক্ষ্মী ইচ্ছা করিয়া কে গৃহে আনিবে, কাজেই সমস্ত দিনের পর সে সরকারে উপস্থিত হইয়া, তাহার বিনিময়ে সে উচিত মূল্য চাহিল। অলক্ষ্মীর কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী-বর্গ তাহাকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী কিন্তু নাছোড়বান্দা, সে বলিল,—বাবুর যখন হুকুম, অবিক্রীত দ্রব্যের মূল্য প্রদান করিবেন, তখন আমি কেন পাইব না? এতদূর হইতে আসিয়া, যদি আমি অর্থ না লইয়া ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে আমার পুত্র-কন্যা খাইবে কি? ছোটলোকেই সত্যের অপলাপ করে জানিতাম, এখন দেখিতেছি বড়লোকেও কম নয়, ইত্যাদিরূপ বাকবিতণ্ডা কর্ম্মচারীবর্গের সহিত হইতেছে, বৃদ্ধা উচ্চকণ্ঠে কত কথা বলিতেছে।

পান্নালাল সন্ধ্যার সময় পূজাদি সমাপন করিয়া উঠিতেছেন, এমন সময়ে এই সকল কথা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া কর্ম্মচারীবর্গকে নিজের সত্য বজায় রাখিতে বলিলেন এবং তাহাকে উচিত-মূল্য দিয়া বিদায় করিলেন। ইহাও তাঁহার পার্থিব অধঃপতনের দ্বিতীয় কারণ; রজনী যোগে অপরাপর দিনের মত তিনি নিদ্রোত্থিত হইয়াছেন, আপন ইষ্টসাধনে বসিয়াছেন, কোনদিন এমন হয় না, প্রেমভক্তির এমন একত্র সমাবেশ তিনি জীবনে কখন উপভোগ করেন নাই। দেখিতে-দেখিতে অন্ধকার গৃহ আলোকময় হইল, স্বর্গীয় সৌগন্ধে গৃহ আমোদিত হইলে একটী অনিন্দ্যসুন্দরী মাতৃমূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া বলিলেন বৎস! আমি তোমার সৌভাগ্য-লক্ষ্মী; তুমি অলক্ষ্মী গৃহে আনিয়াছ বলিয়া আমি আর থাকিতে

পারিব না, তাই চলিয়া যাইতেছি। সত্যকিঙ্কর পান্না-লাল স্তম্ভিত হইয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কোন কথা বলিলেন না, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর গৃহবহির্গমনে কোন বাধা দিবার প্রতিবাক্য তাঁহার বদন হইতে নিঃসৃত হইল না, তিনি মনে-মনে বলিলেন,—কই! কোনও পাপ ত করি নাই; সত্য রক্ষা করিয়াছি মাত্র—ইহা কি পাপ? দেখিতে-দেখিতে বাস্তু দেবতা মহামায়া দেবী পান্নালালের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বৎস! আমি চলিলাম,—তুমি অলক্ষ্মী গৃহে আনিয়াছ, আর থাকিতে পারিব না।

পান্নালাল কোন কথা কহিলেন না, নতশীরে প্রণাম করিলেন। এইরূপে সকলেইএকে-একে বিদায়হইয়া পান্নালালকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। এই সময় পান্নালালের চারিদিকে গোলযোগ বাধিয়া গেল; সকল কাজেই লোকসান হইতে লাগিল। চুনী আসিয়া বলিল,—দাদা! এ কিরূপ হইতেছে, পূর্ব্বে যে সকল কাজে অজস্র টাকা আমদানী হইত, এক্ষণে সেই সকল কাজেই লোকসান হইতেছে,—ইহার কারণ কি?

ধনাগম রুদ্ধ হইতেছে; যে বিষয়ে তিনি এতদিন বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন,—ভাই! চিরদিন কি সমান-ভাবে কাহার উপায় উপার্জ্জন থাকে, কম হইবে বই কি? অর্থ যত কম হয় ততই ভাল, ইহাতে পরমার্থের প্রতি মন পড়িবে, ইহকালের সুখভোগ ত যথেষ্ট হইল, এইবার পরকালের প্রতি দৃষ্টি

নিক্ষেপ কর, তাহার জন্য প্রস্তুত হও, ইহকাল ত আর সর্ব্বস্ব নহে, ইহার পর যে পরকাল আছে। এই কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া যে একদিন আমাদের চলিয়া যাইতে হইবে, সেই পথের সম্বল ত কিছু করা হয় নাই, সে পথে যাইতে হইলে ত অর্থাদির দ্বারা কোন কাজ হইবে না—রাহা-খরচ চলিবে না, সেখানে যে ধর্ম্মের আদান-প্রদান হয়। অতএব ধর্ম্মসঞ্চয়ে মন দাও।

চুণী প্রজ্ঞাযুক্ত হইলে সেবাধর্ম্মে অর্থের অনেক সদ্ব্যয় করিতেছিলেন, নিজে উপায়ক্ষম না হইলেও ভ্রাতার ধনে সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়া একপ্রকার মজিয়া গিয়াছিলেন, অর্থের মোহে বশীভূত হইয়া একপ্রকার কাজকর্ম্ম করিতেছিলেন। পূর্ব্বে যে সকল অপকর্ম্ম তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এখনকার ধর্ম্মকর্ম্মে তাহা একপ্রকার চাপা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল, সকলের নিকট তিনি সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছিলেন। এক্ষণে পরম ধার্ম্মিক ভ্রাতার অবস্থা পুনরায় মন্দ হইতে চলিল, ইহাতেও পান্নালালের কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা বিষাদ ভাব দেখা গেলনা দেখিয়া চুণীলালও প্রকৃতিস্থ হইলেন, নিজের বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করিলেন। জগতের কিছু ত চিরস্থায়ী নহে, ইহার কিছুই ত সঙ্গে যায় না, যাইবেও না, তবে তাহার জন্য বিষাদ কিসের; দেব-হৃদয় দাদা কই কিছুতেই ত টলেন নাই। চিরকালইত সমান ভাব, বৌদিদিও ত কই বিষাদিত নহেন, তবে আমার এ ভাব কিসের জন্য; চুণীলাল স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, যাহা হইবার তাহা হইবে, সে গতির প্রতিরোধ করা মানুষের সাধ্য নয়। তবে সাধ্যানুসারে ধর্ম্ম-রক্ষা করাই শ্রেয়। চুণীলাল

দ্বিরুক্তি করিলেন না, ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া বিষয় আশয়ের রক্ষণা-বেক্ষণ যতটুকু হয়—করিতে লাগিলেন। ইহাতে যত থাকে, আর যত যায়, তাহার উপর হাত কাহার? জগদীশ্বরের হস্ত সতত প্রসারিত থাকিয়া, মানবভাগ্য যেরূপ ভাবে চালাইতেছেন, ইহা সেইরূপ চলিতেছে। যাহা যাইবে—তাহাকে রক্ষা করা কাহার সাধ্য নাই।

বগলাচরণ এত তত্ত্ব কিছু বুঝেন না, তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে ভগ্নীপতির বিপুলবিষয়ের কোনরূপ ক্ষয় না হয় কিন্তু তিনি একাকী কি করিবেন? পরম বিশ্বাসী সরকার **স্বরূপ ঘোষ** অনেকদিন হইল, ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে, অবস্থা বৈগুণ্যের সূত্রপাতেই পরম মিত্র **যদুপতি** কালকবলিত, এখন যাহারা আছে, তাহারা সকলে স্বার্থপর; প্রভুর বিষয় যায় আর থাকে, তাহাতে তাহাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; নিজের স্বার্থটী সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিতে পারিলেই হইল! কাজেই যেখানে দুইশত টাকা ক্ষতি হইল; স্বার্থপর কর্ম্মচারীবর্গ সেই স্থানে হাজার টাকার হিসাব দিল। ইহাতে আর বিষয় কতদিন থাকিবে?

কয়েকমাসের মধ্যেই গুরুদেবের ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হইল, **পান্নালালের** পার্থিব অদৃষ্ট আঁবার কুয়াযাচ্ছন্ন হইল কিন্তু তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। অত্যধিক অর্থাগমে ধর্ম্ম নষ্ট হইবার ভয়ে তিনি এতদিন বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে **মহামায়া** কৃপা করিয়াছেন, অসার বিষয়ে আর তাঁহাকে মজিয়া থাকিতে হইবে না, এইবার প্রাণভরিয়া তিনি কেবল ধর্ম্মপথেই বিচরণ করিতে পারিবেন ভাবিয়া বড়ই

সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার প্রাণে যে আসক্তিটুকু ছিল, সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করিবার যে প্রবৃত্তিটুকু এতদিন প্রবল ছিল, তাহা মিটিয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর বৃথা মোহে মুগ্ধ হইয়া পরকাল নষ্ট করা উচিত নয়। পান্নালাল সে দিন পূজার সময় ভগবানের প্রতি বড়ই আনুরক্তি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূজায় সে দিন কিন্তু নানাপ্রকার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল, তিনি শ্রীহরির স্মরণ করিয়া পুনরায় ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন, ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়মন্দিরে মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহাকে ছাড়িবার বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। একে একে সকলে যখন তাঁহাকে ছাড়িয়াছেন, তখন ধর্ম্ম আর থাকিতে চান না। পান্নালাল স্তব্ধ হইয়া ধ্যানভঙ্গ করিয়া বলিলেন—প্রভু! এ কি কথা, তোমাকে ত আমি ছাড়িব না। তোমার জন্যই আমি অলক্ষ্মী ঘরে আনিয়াছি, সত্যধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্যই ত বৃদ্ধার প্রদত্ত অলক্ষ্মী কিনিয়া আমি লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি, লক্ষ্মীছাড়া হই, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু ধর্ম্ম ছাড়া হইব কেন? যদি আপনি আমাকে এ সময়ে ফেলিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে ধর্ম্ম বলিয়া আর কোন দ্রব্য জগতে বর্ত্তমান থাকিবে না, লোকে আর ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে না? আজ হইতে ধর্ম্ম কথা একেবারে লোপ পাইবে। এই বলিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইয়া দৃঢ়রূপে তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিলেন। বাস্তবিক ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্যই পান্নালাল অলক্ষ্মী গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে। ধর্ম্মরাজ ইহা বুঝিয়া ক্ষান্ত হইলেন, আর যাইতে পারিলেন না।

পরদিন **পান্নালালকে** আর কেহ দেখিতে পাইল না, তিনি রজনী যোগে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। পুত্র-কলত্রের মায়া করিলেন না, আত্মীয়পরিজনের প্রতি ফিরিয়াও দেখিলেন না, ধর্ম্মকে হৃদয়ে ধরিয়া পরম ধার্ম্মিক **পান্নালাল** সংসার পরিত্যাগ করিলেন। **শিবানী** শুনিয়া প্রথমে বড়ই চঞ্চল হইয়াছিলেন, তারপর সতী বুঝিলেন,—স্বামী ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছেন, আমি সহধর্ম্মিনী হইয়া ইহার জন্য অনুতাপ করিব না, তাহা হইলে তাঁহার ধর্ম্মোপার্জ্জনে ব্যাঘাত হইবে। পতিব্রতা সতী আর শোক করিলেন না। প্রাণপ্রিয় স্বামীর মঙ্গলকামনা করিয়া প্রাণে সান্ত্বনা-সলিল সেচন করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে **চুনীলালকে**ও আর কেহ দেখিতে পাইল না। তিনি ত দার পরিগ্রহ করেন নাই, এই জন্যই ত তিনি সংসারী হইয়া সংসারের ভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। **বগলাচরণ** বিষয়ের শেষ-পরিণাম অতি ভয়াবহ হইবে দেখিয়া তিনি আর তথায় রহিলেন না। তিনি না থাকিলে **শিবানীকে** স্ত্রীলোক ভাবিয়া, অপগণ্ড শিশুগণের মুখের প্রতি চাহিয়া বরং পাওনাদারগণ কিছু ছাড়িয়াও দিতে পারে; এই আশায় ভগ্নীকে বুঝাইয়া তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। **শিবানী** স্বামীর ঋণ এক কপর্দ্দক রাখিলেন না, সমস্ত বিক্রয় করিয়া উত্তমর্ণগণকে প্রদান করিলেন। এইবার বুঝি সতীর প্রতি পরীক্ষা আরম্ভ হইল, **শিবানী** এইবার দারিদ্রের কঠোর কটাক্ষে পতিত হইলেন। দেখা যাক্ সতীত্ব তেজ দারিদ্রের তাড়নে ক্ষয় হয়, কি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়!

দ্বিতীয় খণ্ড

ভক্তি ও মুক্তির সোপান

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

পতিহারা

রাজরাণী আজ ভিখারিণী। পান্নালাল চলিয়া গিয়াছেন, সংসার-বৈরাগ্যই তাঁহার এ প্রস্থানের কারণ—যাইবার কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন, আমি এক্ষণে গুরুগৃহে যাইব—তাঁহার সহিত কিছুদিন তীর্থ-পর্য্যটন করিব। মনুষ-জীবন শুধু পশুর মত আহার-নিদ্রা, ভয় মৈথুন লইয়া নষ্ট করিলে ত চলিবে না। ভগবৎ প্রাপ্তি, তাঁহাকে লাভ করিয়া জীবন ধন্য করাই উদ্দেশ্য, অতএব আর কতকাল আমার-আমার করিয়া বসিয়া-বসিয়া, কাটাইব? শিবারাণী! এইবার তোমার উপর ঘোরতর পরীক্ষা আরম্ভ হইবে, সাবধান যেন পরীক্ষায় ভয় পাইও না—মহাশক্তির অংশে তোমাদের জন্ম, এ জগতে তোমাদের অসাধ্য কিছুই নাই, ভগবতীর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, গোষ্পদের ন্যায় এসকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিবে, আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তুমি কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না। শেষদিনে পুরুষোত্তমে একচিতায় দুইজনে ভষ্মীভূত হইব—সেজন্য চিন্তা করিও না। তুমি আমি কখন ছাড়া নহি—চিন্তা করিলেই হৃদয়-মধ্যে দেখিতে পাইবে।

আজ পাঁচ বৎসর হইল, পান্নালাল গৃহত্যাগ করিয়াছেন, শিবাণী কেবল জীবনধারণের জন্য একবেলা আহার করেন, তাও আবার ভিক্ষা করিয়া অতিকষ্টে চালাইতে হয়। তিনটী অপগণ্ড শিশুপুত্র এবং যদুপতির বৃদ্ধা গৃহিণী কমলকুমারীকে লইয়া অতি-কষ্টে দিনপাত করেন। কমলকুমারী অতিশয় বৃদ্ধা হইয়াছেন, কোথাও যাইবার ক্ষমতা নাই; তথাপি তিনি পুত্রতিনটীর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। উত্তমর্ণগণের পরিত্যক্ত একখানি ক্ষুদ্রকুটীর এখন তাহাদের বাস গৃহ, শিবাণী সমস্ত দিন গ্রামান্তরে ভিক্ষা করিয়া, সন্ধ্যার প্রাকালে গৃহে আসিয়া রন্ধনাদি করেন, তাহাদের অন্ন-জল প্রদান করেন, পরে আপনি যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া অতি দীনভাবে,—কঠোর-পরিশ্রম করিয়া কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া আছেন।

একদিন যাঁহার সুখের অবধি ছিল না, যাঁহার অমানুষিক সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য প্রতিবাসী কত রমণী লালায়িত হইয়া, তাঁহার গৃহে উৎকণ্ঠিত হইয়া উপস্থিত হইত, যাঁহার সহিত দুই-একটী বাক্যালাপ করিবার অন্য সকলে ঔৎসুক্য সহকারে করযোড় করিত—সেই রাজরাণী আজ পথের ভিখারিণী, বাস্তবিক মুষ্টিভিক্ষা আজ তাঁহার জীবনধারণের একমাত্র উপায়।

শিবাণী তখন যেমন—সেই ঐশ্বর্য্যের অবস্থায়ও যেরূপ ছিলেন, আর এখন এই কপর্দ্দকহীনের অবস্থাতেও ঠিক সেইরূপ, চাল-চলন কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই! শিবাণীর বিলাসিতা কখন ছিল না, এত বিষয়-সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া একখানি

মোটা কাপড় আর মণিবন্ধে ত্নইগাছি শাখা ভিন্ন কোন প্রকার বেশভুষা তাঁহার দেখিতে পাওয়া যাইত না ; এখনও ঠিক সেইভাব, কম্বলাসনে ভূমি-শয্যায়ই এখন তাঁহার সকল অভাব মোচন করিয়া থাকে।

পতি গৃহত্যাগী-সন্ন্যাসী, পত্নীও তাঁহার সেইরূপ সকল বিলাস-বাসনা বিবর্জিতা, তৃণ-শয্যাই তাঁহার শয়নের প্রকৃত শয্যা, কিন্তু অপগণ্ড শিশু-তিনটী যে তাঁহার স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি, তাহাদের কষ্ট দিলে যে স্বামীর অপত্যগণকে কষ্ট দেওয়া হইবে, এইজন্য তৃণ শয্যার পরিবর্ত্তে কম্বলাসনই সার করিয়াছিলেন।

আদরের কন্যা **প্রভাবতীকে পান্নালাল** বিশিষ্ট কুলীনের গৃহে বিবাহ দিয়া একখানি জমীদারী যৌতুক দিয়া গিয়াছেন। সে বড় জমীদারের পুত্র-বধু হইয়াছে। এক্ষণে শ্বশুর-শাশুড়ীর স্বর্গারোহণে **প্রভাই** সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়াছে। স্বামী **সুশীলকুমার** কিছুই দেখেন না। তিনি পিতামাতার মৃত্যুর পর বন্ধু-বান্ধব লইয়া ব্যস্ত, জমীদারীর কি হইতেছে না হইতেছে—তাহা দেখিবার তাহার সময় অতি অল্প ; **পান্নালাল** বড় আশা করিয়া নিজের অপেক্ষা বড় কুলীনের ঘরে কন্যাকে সম্প্রদান করিয়া বংশ-মর্য্যাদা বাড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি যতদিন সংসারে ছিলেন, ততদিন **সুশীল কুমার** বিগড়াইতে পারে নাই ; কারণ শ্বশুরের অপ্রতিহত প্রভাব, একজনকে হুকুম করিলে শতজন দৌড়িয়া আসিয়া, তাঁহার পক্ষসমর্থন করিবে। কাজেই পিতামাতা স্বর্গগত হইলেও, শ্বশুরের ভয়ে **সুশীলের** মনের ভাব মনেই মিলাইতেছিল। কিন্তু

পান্নালালের ন্যায় ধর্ম্মপথগামী শ্বশুর ত আর চিরকাল তাহার জন্য বসিয়া থাকিবেন না, নিজের চিন্তা ত করিতে হইবে! **পান্নালাল** গৃহ-ত্যাগী হইবার পর হইতেই **সুশীলের** মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে। পাঁচ বৎসরের মধ্যে জমীদারীর প্রায় সমস্ত নষ্ট করিয়াছে। তাহাকে উদাসভাবাপন্ন দেখিয়া নায়েবগোমস্তা সকলেই প্রভুর সর্ব্বনাশ করিয়া, নিজেদের উদর-পূর্ত্তি করিতেছে। উড়াইয়া দিলে রাজার রাজত্বই বেশীদিন টিকে না, আর এত সামান্য জমীদারী কত দিন থাকিবে?

প্রভাবতী জননী **শিবানীর** নিকট যাবতীয় বিষয় শিক্ষা করিয়াছে, স্বামী স্ত্রীলোকের দেবতা, দেবতা যাহা করিবে, তাহার প্রতিবাদ করা বা তাঁহার অপকর্ম্মের জন্য ভুলেও অবজ্ঞা প্রদর্শন করা পত্নীর উচিত নহে। বরং প্রাণপণে সহ্য করিয়া, প্রকারান্তরে সময় পাইলে ধীর-স্থিরভাবে তাঁহার কার্য্যাবলী তাঁহাকে তন্ন-তন্ন করিয়া, বুঝাইয়া দিয়া মন্দ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হয়, নতুবা হটকারিতার বশবর্ত্তিনী হইয়া, একেবারে দোষ সংশোধন করিতে গেলেই অমৃতে গরল উত্থিত হইবে, তখন সে গরল ভক্ষণে একজন না একজনের প্রাণের হানি অনিবার্য্য।

প্রভাবতী জননীর হাতেগড়া গৃহিণী, কাজেই সে স্বামীর এত কু-অভ্যাস, এত অত্যাচার অনাচার দেখিয়াও সহসা কিছু বলিতে পারিত না, কেবল কাঁদিত, সময় পাইলে পায়ে ধরিয়া বলিত দেখ,—আমি স্ত্রীলোক বুদ্ধিহীনা, তুমি গুরু, মাথার মণি, আমার কোন কথা বলা বা উপদেশ দেওয়া সাজে না, তবে চক্ষের উপর

নায়েব-গোমস্তারা বড়ই অনিষ্ট করিতেছে, তুমি একটু বুঝে চলো, নতুবা জমীদারী আর বেশীদিন থাকিবে না। এই সৎ-উপদেশের বিনিময়ে **প্রভাবতী** কেবল দন্ত কিড়িমড়ি ও আরক্তিম চক্ষুর একটু রোষাভাস লাভ করিতেন, তা ছাড়া অন্য কোন ফল হইত না। **সুশীল** চকিতের ন্যায় বাটী আসিতেন ও তাড়াতাড়ি দুইটী আহার করিতেন, তারপর হাতাপাতি করিয়া যাহা কিছু পাইতেন লইয়া চম্পট দিতেন!

সংসারের কি হইল, গর্ভবতী **প্রভাবতীর** আহারাদির ব্যবস্থা কিরূপ হইতেছে, সে শারীরিক কিরূপ আছে, একদিনের জন্য **সুশীল** তাহা জিজ্ঞাসাও করিত না। **প্রভাবতী** ইহার জন্য যে বেশী কিছু দুঃখিত ছিলেন, স্বামী তাহার সম্বন্ধে কিছু দেখেন না বলিয়া **প্রভাবতীর** তিলমাত্র যে চিন্তা ছিল, তাহা নহে, তিনি যে অত্যধিক অত্যাচারে নিজের শরীর নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন, এই চিন্তাই তাহার মহাচিন্তা হইয়াছিল। আর কিছুদিন এইরূপ চলিলে যে অচিরকাল মধ্যে তাহার শরীর নষ্ট হইবে, তাহাদিগকে পথের ভিখারী হইতে হইবে, ভাবিয়া **প্রভাবতী** মর্ম্মান্তিক যাতনায় দিন-দিন শুখাইয়া যাইতে লাগিলেন। জননীর অবস্থা তেমন নহে, তিনি নিজের লইয়াই ব্যস্ত, তাঁহাকে যে দুই-একদিনের মত লইয়া আসিবেন, সে আশাও নাই। **শিবানী**ও অনাহারে মরিয়া যাইলে কখন জামাইবাটীর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না—ইহা স্থির নিশ্চয়। সময়ে-সময়ে **প্রভাবতী** জননীকে আসিবার জন্য আপন দুঃখ জানাইলে, **শিবানী** নিজের ধর্ম্মপ্রাণতা গুণে বলিতেন,—মা, কপাল

ছাড়া পথ নাই, তবে ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিও, কষ্টের মধ্যেও সুখের মুখ দেখিতে পাইবে,—হতাশ হইতে হইবে না। প্রাণ দিয়া পতির সেবা করিবে, সেবার ফল অত্যন্ত লোভনীয়, সেবার ফলে হিংস্র পশুও বশ হয়, সুশীল ত মানুষ, কত অনিষ্ট করিবে? তুমি আসন্নপ্রসবা জানি, তজ্জন্য ভয় করিও না, গৃহে কেহ নাই, কিন্তু উপরে ত একজন আছেন, তিনি দেখিবেন, তিনি দেখিলে, তাঁর প্রতি ভক্তি রাখিলে আর কাহার সাহায্য আবশ্যক হইবে না, দিন-কাল হইলে আমাকে সংবাদ দিবামাত্র যাইয়া উপস্থিত হইব, সে সময় জামাইবাড়ী বলিয়া মানিব না, তোমার জন্য যাইব, বংশের তিলক দেখিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে যাইব। সুশীলকে দেবতার মত দেখিবে, সে বিগ্‌ড়াইয়াছে বলিয়া অমান্য করিও না। সময় হইলে আবার সব ঠিক হইবে।

কমলকুমারী আর চক্ষে দেখিতে পান না, শিবানী তাঁহাকে নিজ শাশুড়ীর মত হাত ধরিয়া খাওয়ান, স্নান করাইয়া দেওয়ান, প্রভৃতি করিতেন! পতির বন্ধুপত্নীর উপর এরূপ মমতা, এরূপ আদর-যত্ন, বিশেষতঃ এই দারুণ দৈন্যাবস্থায় কেবল শিবানীর মত দেবীস্বরূপিণী স্ত্রীলোকেরই শোভা পায়, অন্যের পক্ষে অসম্ভব। এত কষ্টে শিবানীর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কিছুমাত্র কমে নাই, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। দিবসের কর্ম্মক্লান্ত জীবনে একটুমাত্র অবসর পাইলেই তিনি হৃদয়-মন্দিরে প্রাণের দেবতা; হৃদয়ের একমাত্র আনন্দস্বরূপ আনন্দময় সত্যদেব পান্নালালের চিন্তা করিয়া, প্রেমাশ্রু-বিগলিত-নেত্রে দেবতার মানস-পূজা করেন, যখন প্রাণটা অতিশয় আন্‌চান করে, তখন তাঁহার সেই বিদায়

কালীন শ্রীমুখের বাণী, শ্রীক্ষেত্রে মিলন হইবে, সে মিলনে আর বিচ্ছেদ হইবে না, ইত্যাদি চিন্তা করেন, দেবতার পাদপদ্ম লাভ শীঘ্রই হইবে বলিয়া আশান্বিতা হন। যখন কোন প্রকারে মনকে প্রবোধ দিতে না পারেন, যখন অদর্শন-যাতনা একেবারে প্রাণকে অসহ্য-যাতনা প্রদান করে, তখন স্বামীর স্বরূপ-মূর্ত্তি তাঁহার প্রাণের পুতলীদের বাহুবেষ্টন করিয়া হৃদয়ে চাপিয়া ধরেন, তাহাতে তাঁহার সকল যাতনা, সকল দুঃখ অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয়। এইরূপ সুখ-দুঃখে আরও দুই-তিনমাস কাটিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিপদ ঘনীভূত

মানুষ হইয়া মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করা—এ জগতের চিরন্তন রীতি। তোমার বড় আশ্রিত ব্যক্তি, একসময় যে তোমার সর্ব্বপ্রকার সাহায্যলাভ করিয়া আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে; একটু ফাঁক পাইলে, তোমার সামান্য একটু দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইলে, আর ধর্ম্মের দিকে না চাহিয়া একবারে তোমার ঘাড়ে চড়িয়া বসিবে, তোমার সকল প্রকার অনিষ্ট সাধন করিতে সে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিবে না।

পান্নালাল যতদিন বিষয়-সম্পত্তি নিজে দেখিতেছিলেন, যতদিন যদুপতি, স্বরূপ ঘোষ জীবিত ছিলেন, ততদিন আত্মীয়-স্বজন সকলেই পান্নালালের বশে ছিল, আপনভাবে কাজকর্ম্ম সমাধা করিয়া জমীদারীর বেশ উন্নতিসাধন করিয়া আসিতে-

ছিল। তখন যে এত বড় একটা সম্পত্তি এমন ভাবে ছারখার হইয়া যাইবে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। যাই যদুপতি ও বৃদ্ধ স্বরূপ ঘোষ লোকলীলা সম্বরণ করিলেন, তাঁহাদের মৃত্যুতে যাই পান্নালাল একটু বৈরাগ্যের পথে ধাবমান হইলেন, জগতের সমস্ত অনিত্য, আমারও এমনি একদিন আসিতেছে ভাবিয়া, একটু ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন, গৃহ-ত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন, অমনি এমন উপকারী, এত যে ধার্ম্মিক বন্ধুগণ একেবারে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল, বগলাচরণ প্রাণপণ করিতেছিলেন, ভগ্নীর দুর্ভাগ্যের প্রতিরোধ করে কত অমানুষিক কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছিলেন, কিসে দুপয়সা টানিয়া রাখিতে পারি। জ্ঞাতি-শত্রুগণ দেখিল, ইহাকে কোন প্রকারে সরাইতে না পারিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না, তাই প্রাণ-সংহারের ভয় দেখাইয়া তাঁহাকেও শিবপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করাইল; তিনি এখানে থাকিলে প্রাণে মারা যাইবেন, এই ভয় দেখাইলে বগলাচরণ আর কি করিবেন, সরিয়া পড়িলেন।

তখন ইংরাজ-রাজত্বে পুলীশের এত ক্ষমতা ছিল না; জোর যার তারই আধিপত্য বেশী, কাজেই বগলাচরণ প্রাণভয়ে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া, ভবিষ্যতে যদি কিছু করিতে পারেন, রাজদ্বারে যদি কিছু উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন, তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শিবাণী পুত্রতিনটী ও কমল-কুমারীকে লইয়া নিতান্ত দরিদ্রার ন্যায় একখানি পর্ণকুটীরে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বিষয় যে কেমন করিয়া নষ্ট হইল, তাহার বিন্দুবিসর্গও তিনি জানিতে পারিলেন না। অদৃষ্টের

বিরুদ্ধে ত কোন হাত নাই। দেবতা যখন গৃহত্যাগী, তখন বিষয় ভোগ বোধ হয়,—আমার উপযুক্ত নহে। তিনি ত বলিয়া গিয়াছেন, এইবার হইতে **মায়ার খেলা** আমার উপর দিয়াই পরিচালিত হইবে। এইজন্যই ত তিনি যাইবার সময় বারবার সাবধান করিয়া দিয়া গিয়াছেন—যেন অধঃপতন না হয়, আমাকে ত সেইদিকেই প্রখরদৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পান্নালালের জ্ঞাতি-কুটুম্বগণ এখন অনেক অংশে প্রতি-পত্তিশালী, তাহাদের দিন বেশ সুখে চলিতেছে, হতভাগিনী **শিবা-নীর** দিন, কেবল অচল; চলে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভগবানের রাজত্বে কেহ না খাইতে পাইয়া মরে না বলিয়াই বুঝি তাহাদের অস্তিত্ব এখন বজায় আছে, নতুবা ইহা অপেক্ষা মরণ সহস্রগুণে শ্রেয়—ইহা আমাদের মত; তবে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি, মহামহিমময়ী **শিবানীর** প্রাণের ধারণা কি—তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না; অত উচ্চ অবস্থার পর এত হীন অবস্থা হইলে আমরা যেরূপ বাঁচিতাম—যেরূপ মরমে মরিয়া কোন একপ্রকারে থাকিতাম, হয়ত বা অসহ্য বোধে থাকিতেই পারিতাম না। **শিবানীর** সে ভাব নাই। তাঁর হৃদয় ত এত ক্ষুদ্র নয়? অবস্থা পরিবর্ত্তনে তাঁহার যে কোনরূপ অসহ্য কষ্ট হইয়াছে, তাহা ত কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে দরিদ্রতা হেতু শরীর অত্যন্ত কষ্টভোগ করিলে, যেরূপ একটু জ্যোতিঃহীন হয়, **শিবানীর** ভাবও সেইরূপ।

শিবানী পরম রূপবতী, বয়স অধিক হইলেও এখন সে রূপ-সাগরে ভাটা পড়ে নাই। যখন দারিদ্র্যের প্রকোপ খুব বেশী

হইল, প্রাণপতি যখন "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" কোনদিক না চাহিয়া পরকাল নিস্তারের জন্য গুরু-গৃহে, সেই অরণ্য হইতেও ভীষণ, নানা হিংস্রক-জন্তুসমাকুল হিমালয়ের পাদদেশে প্রস্থান করিলেন, আর যখন একপ্রকার ভিক্ষাই তাঁহার উপজীবিকা হইল, তখন তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, প্রভু! সুখ-দুঃখ তোমারই দান, সুখ দিয়াছিলে ভোগ করিয়াছি, এখন দুঃখ দিতেছ ভোগ করিতে প্রস্তুত, আমাদের দ্বারা কত লোককে প্রতিপালন করাইয়া লইয়াছ, এখন আমাদিগকেই পরের প্রতিপাল্য রূপে দাঁড় করাইয়া ভিক্ষা-পাত্র হাতে দিতেছ, দাও, তাহাতে কাতর নই, কিন্তু প্রভু! তোমার প্রদত্ত লোকমুগ্ধকর আমার এই পোড়া রূপ যাহাতে না থাকে—তাহা কর; যাহাতে লোকে আর আমার প্রতি তীব্র দৃষ্টি না করে—সেইরূপ কর, এখন ত আর বাটীর বাহির না হইলে চলিবে না? তবে রূপ লইয়া লোকের চক্ষুশূল হইব কেন? যাঁহার জন্য রূপ, যিনি আমাকে রূপসী দেখিয়া কত আদর করিতেন, **ভগবতী** আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া, সোহাগের সরোবরে ভাসাইতেন, তিনি ত আর এখানে নাই, এখন যে আমি অকূলে, তাঁহার তিনটী অপগণ্ড শিশু আমার স্কন্ধে ন্যস্ত, তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হইবে, মান-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া দ্বারে-দ্বারে যাইতে হইবে, অতএব যাইবার পথের কণ্টক—এই রূপ-জ্যোতি আমার হরণ করিয়া লও, আমি নির্ব্বিঘ্নে তোমার দান এই দারিদ্রকে বরণ করিয়া মাথায় তুলিয়া লই।

পান্নালাল গৃহত্যাগের চারি-পাঁচমাস পরে এইরূপ

প্রার্থনা করিবার পর বাস্তবিকই সতীর বাহিক সৌন্দর্য্য যেন বিমলিন হইয়া গেল, এতগুলি পুত্রের জননী হইয়াও, যাহার রূপ-যৌবন অক্ষুণ্ণ ছিল, এক্ষণে দিনে-দিনে তাহা যেন বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এখন তিনি দর্পণে নিজেকে দেখিয়াই আর চিনিতে পারেন না, সতী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। রূপটা নাকি ভয়ানক সম্পদ, স্ত্রীলোকের অর্থ থাকিলে কেহ তাহার প্রতি চাহিতে না পারে, কিন্তু নিরাশ্রয়া হইয়া রূপ-সম্পদে সম্পত্তিশালিনী হইলে তাহার আর রক্ষা নাই, দস্যু-তস্কর অনবরতই তাহার পাছে-পাছে ঘুরিবে। সে রূপ যখন গেল, তখন আর ভয় কি, **শিবানী** প্রত্যহই গ্রামান্তরে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া আনেন, তিনচারিটি প্রাণীর ভরণ-পোষণ করেন, **কমলকুমারী শিবানীর** এই সহিষ্ণুতা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন, ইহারা স্বামী-স্ত্রীতে কি অমানুষিক গুণ-সম্পন্ন, কিছুতেই দৃকপাত নাই, সুখেও যেমনি, দুঃখেও তেমনি হাস্যবদন। মরি মরি কি বাহাদুরী!

কমলকুমারী অতিশয় বৃদ্ধা হইয়াছেন, কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই, তথাপি **শিবানীর** উৎসাহপূর্ণ বদন-মণ্ডল দেখিয়া তিনিও এই বয়সে এই দরিদ্রতার প্রকোপে পড়িয়া সাধ্যানুসারে কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। **শিবানী** ভিক্ষায় বাহির হইয়া যান, **কমলকুমারী** পুত্রতিনটীকে প্রাণের মধ্যে টানিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করেন! নিকটবর্ত্তী অরণ্য হইতে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করেন। রন্ধনের কষ্ট নাই বটে, কিন্তু বৌ-মা কখন আসিবেন, তারপর কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া রন্ধনাদি করিতে বড়ই কষ্ট হইবে, শিশুগুলি ক্ষুধায়

আকুল হইয়া পড়িবে, বৃদ্ধা তাই ক্ষমতানুসারে তাঁহার সাহায্য করিতেন। শিবানী তাহা দেখিয়া বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইতেন, বলিতেন "মা! তুমি অতিশয় বৃদ্ধ, দাঁড়াইতে অশক্ত, তাহার উপর এখন কার্য্য করিতে বেশী দূরবনে যাইও না, আঘাত লাগিলে অত্যন্ত কষ্ট পাইবে, আমার এখন সময় আছে, আমি সমস্ত করিয়া লইব। আপনি কষ্ট করিবেন না, সাহায্য করিতে যাইয়া এই বৃদ্ধবয়সে নিজে কষ্ট পাইও না। তোমরা যে আমাদের অনেক করিয়াছ; তাহার সমান উপকার কি আমি এ জীবনে করিতে পারিব? আমার জীবনের জীবনকে যে তোমরা ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল দিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছ, সে উপকার এ জীবনভোর পরিশ্রম করিলেও কি পরিশোধ করিতে পারিব; মা! তুমি আমার পুত্রতিনটীকে দেখো, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।"

শিবানীর পুত্রতিনটীর নাম ভবানীপতি, দুর্গাপতি ও উমাপতি, জ্যেষ্ঠ ভবানীপতি একটু বড় হইয়াছে, শেঠের কোলে আট-নয় বৎসরের, তারপর সকলেই দুই-এক বৎসর করিয়া ছোট, এখন ভালরূপ জ্ঞান হয় নাই, তাই মায়ের নিকট ভাল খাইব, ভাল পরিব বলিয়া কত আবদার করে, নিজেদের অবস্থার বিষয় ত তাহাদের জ্ঞান নাই, তাই অপরের ছেলেরা যেরূপ করে, যেরূপ খায় পরে, ইহারাও সেইরূপ চায়, মায়ের প্রাণ তাহাতে বাধা দিতে পারে না। যখন ছেলেরা কাপড়ের জন্য অতিশয় আবদার করে, তখন বনবাসিনী ধ্রুব-জননী সুনীতির ন্যায় চেলখণ্ড পরাইয়া তাহাদিগকে খেলিতে

পাঠাইয়া দেন, আর বুলিয়া দেন, বাবা! আমি ঘরে না থাকিলে, তোমাদের দাদুকে ছাড়িয়া কোথাও যাইও না, তিনি বুড়ো মানুষ, তোমাদের খুঁজিতে পারিবেন না। পান্নালালের সন্তানগণ কমলকুমারীকে চিরকাল "দাদু" বলিয়া ডাকিতে অভ্যস্থ হইয়াছে। বলা বাহুল্য—তাহারা মায়ের কথামতই কাজ করিত, শিবানী গৃহে না থাকিলে, তাহারা তাহাদের কুটিরের আশে পাশেই খেলা করিত, বৃদ্ধা ডাকিলেই দৌড়িয়া আসিত। মা ঘরে আসিলে, তবে চেলখণ্ড পরিয়া নিকটবর্ত্তী বালকদের সঙ্গে খেলাইতে যাইত, সমবয়স্ক বালকেরা ঘৃণা-বিদ্রূপ করিলে, তাহাদের সহিত কলহ করিত না, হাসিয়া উড়াইয়া দিত, সহ্য করিত। জনক জননীর ন্যায় তাহারাও সমস্ত মহৎ গুণে বাল্যকাল হইতে অভ্যস্থ হইয়াছিল।

হিন্দুর মহামহোৎসব দুর্গোৎসরের আর বেশীদিন বাকী নাই। দেবীপক্ষের বিমল-জ্যোতি, প্রকৃতি সতীর পূর্ণানন্দময় ক্রোড়ে প্রতিভাত হইয়া সকলের প্রাণেই আনন্দ ঢালিয়া দিতেছে, বালক-বালিকার প্রাণ ত চির আনন্দময়, এ সময় তাহাদের আনন্দ-সাগর উথলিয়া উঠিয়াছে, ধনী সন্তানগণ নানাপ্রকার পোষাক পরিয়া এ বাটী, সে বাটী করিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইতেছে; পূজার আর বারদিন বাকী, ভবানীপতি একটু বড় হইয়াছে, সে মাকে বেশী কিছু বলিল না, কিন্তু দুর্গাপতি ও উমাপতি মায়ের প্রতি বড়ই জুলুম করিতে লাগিল। বলিতে লাগিল—মা আম্‌লা ছেলা কাপল পল্‌বো না, সকলে নূতন রাঙা কাপল পল্‌ছে, তুই

আমাদেল ভাল কাপল দে। শিবরাণী শিশুদের নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও চুম্বনে তাহাদের সন্তুষ্ট করিয়া রাখিতেন, বলিতেন,—মা দুর্গার কাছে চাও না। তাহারা বলিত—সে কে—তুই তো, আমাদেল দে। জননী অলক্ষিতে দুই-এক ফোঁটা অশ্রু ফেলিয়া, তাহাদের মুখ চুম্বন করিয়া সকল শোক বিস্মৃত হইতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মায়ের কৃপা

বাঙ্গালা দেশকে যতই দুঃখ-দৈন্য ঘেরিয়া ফেলুক না কেন, শরৎকালের মহাপূজার সময়, এত দুঃখের মধ্যে যেন একটা সুখের স্ফুটন্ত ছবি দেশবাসীর প্রাণে জাগিয়া উঠিয়া আবার-বৃদ্ধ-বণিতার হৃদয়ে একটা বহুদিন বিস্মৃত, খুব জানা আনন্দের উন্মেষ করিয়া দেয়, বাঙ্গালীর প্রাণ, অতি বড় দরিদ্র হইলেও, ইহাতে নাচিয়া উঠে। এ সময় সকলেই অবস্থানুসারে ভাল খায়, ভাল পরে, মা-মা বলিয়া ডাকিয়া জগন্ময়ীর দর্শন প্রার্থনা করে।

শিবরাণীও ত আমাদের দেশের পবিত্র-কারিণী পতিব্রতা মহিলা, তাহার প্রাণ গলিয়া যাইবে না কেন? তাই আজ অতি প্রত্যূষে বালকদিগকে বিগত রজনীর পর্য্যুসিতান্ন খাওয়াইয়া এবং কমলকুমারীর জন্য রাখিয়া নিজে অভুক্ত অবস্থায়, ভিক্ষায় বাহির হইলেন, মনোগত ইচ্ছা আজ বেশী দূরে যাইয়া কিছু বেশী

চাউলও ভিক্ষা করিবেন, যদি দুই-একখানি বস্ত্র পান তাহাও সংগ্রহ করিয়া আনিবেন।

স্থানে-স্থানে তাঁহাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন বেশ সঙ্গতীপন্ন আছেন, শিবরাণী তাহাদের ত্রিসীমানায় পদার্পণ করেন না। পাছে তাঁহাকে ভিক্ষা করিতে দেখিলে তাহারা তাঁহার স্বামী-দেবতার নিন্দা করেন, পাছে বলেন—যে মাগ ভিক্ষা করিতে লাগিল, আর তিনি গেলেন ধর্ম্ম করিতে, এ অসহ্য বাক্য তাঁহার ন্যায় সহধর্ম্মিণীর প্রাণে কথনই সহ্য হইবে না, তাই তিনি পরিচিত কাহার বাটী ভিক্ষা করিতেন না, যেথানে কোন আত্মীয় নাই, কেহ তাঁহাদের জানে না, এমন স্থানে যাইয়া প্রার্থনা করিতেন। আজ তাই কিছু দূরে যাইয়া প্রাণ খুলিয়া নিজ আশ্রিতগণের জন্য ভিক্ষা করিবেন, এই আশায় বাহির হইলেন, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিলেন, কিন্তু হা ভগবান! আজ কিছুই হইল না, অন্যান্য দিনের মত তণ্ডুল ভিক্ষাও যে মিলিল না। সমস্ত দিন পথ হাটিয়া শিবরাণী যথন সন্ধ্যাকালে কয়েক কাঠা খুদ লইয়া গৃহে ফিরিলেন, তথন গ্রামের চারিদিকে পূজাবাটীতে ঘোর রোলে বাজনা বাজিতেছে, আনন্দ কোলাহল হইতেছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে হতাশ-অবসন্ন-দেহ শিবরাণী সেই সংগৃহীত খুদগুলি পুষ্করিণীর ঘাটে ধুইতে গিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন, প্রাণে একটা বিষম বিষাদের ছায়া পাত হইয়াছে,—যাহা তিনি জীবনে কথন উপভোগ করেন নাই, হায়! আজ এই দুর্গোৎসবের সময় কত লোক পুত্র-কন্যাগণকে, আশ্রিতগণকে, কত উপাদেয় দ্রব্য থাওয়া-

হইতেছে, কত ভাল-ভাল কাপড় পরাইতেছে, আর মা, আমা ভাগ্যে এইরূপ; বাছাদের বদনে আজ আমি এ সকল অভোজ্য কেমন করিয়া প্রদান করিব? এই বলিয়া নেত্রনীরে বুক ভাসাইতেছেন; এত কষ্ট সহ্য করিয়া শিবানী একদিনের জন্য যাহা করেন নাই, আপনার অবস্থায় আপনি চির-প্রফুল্ল ছিলেন, হায়! আজ আর থাকিতে পারিলেন, ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। হিন্দু-সংসারের দেবীস্বরূপিনী, দয়ার পূর্ণ-অবতার সতীগণ সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু পতি-পুত্রের কষ্ট তাহাদের নিকট অসহ্য; তিনি স্বামী-স্মরণ করিয়া, দেবরের নাম করিয়া কত কাঁদিলেন। তার পর যুক্তকরে বলিলেন,—মহামায়া! মা, আজীবন ত তোমার লীলাখেলা সহ্য করিয়া আসিতেছি, একদিনের জন্য তাহার প্রতিবাদ করি নাই, তোমার কার্য্যের উপর কোন কথা কই নাই, কিন্তু আজ মা! হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, প্রাণ যেন শোকে-দুঃখে আকুলি-বিকুলি করিতেছে, মা! তুমি কৃপা কর, নতুবা আজ পূজার বাসরে এ সকল দ্রব্য মা হইয়া আমি বাছাদের বদনে তুলিয়া দিতে পারিব না, ইহার আগে তুমি আমার জীবন গ্রহণ কর, আমি আর দেখিতে পারি না। পুত্র-স্নেহে অধীর হইয়া শিবানী ধ্যানস্থা হইলেন। ভক্তাধীনা ভগবতী কি আর থাকিতে পারেন, ভক্তের কাতর ক্রন্দন কি তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হইতে পারে? সেই শোকাচ্ছন্ন হৃদয়-সরোবরের দ্বাদশ-দল-পদ্মে পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়া মা আমার শিবানীকে অভয় দিয়া বলিলেন, "মা! বড় অসহ্য হইয়াছে কি? কিন্তু আর বেশীদিন নয়; স্বামীসোহাগিনী পতিব্রতে, আর বেশীদিন স্বামী ছাড়িয়া

থাকিতে হইবে না, প্রিয়ভক্ত পান্নালাল গুরুদেবের সহিত তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে; সকল তীর্থ শেষ করিয়া তীর্থ-শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমে আসিলে তুমি রথযাত্রার দিন তাহার সহিত মিলিত হইবে। সাধকশ্রেষ্ঠ অবধূতের সমক্ষে তোমাদের চির-মিলন সংঘটিত হইবে, আর বিচ্ছেদ হইবে না। যাও সতী! তোমার কুটীরের ঈশান কোণে যদুপতির সংগৃহীত, নিতাইয়ের রক্ষিত এক ঘড়া মোহর আছে—গ্রহণ কর। বাল্যকাল হইতে তুই দুর্গোৎসবের বড়ই পক্ষপাতী, এই অর্থ লইয়া যা—তাহা সম্পন্ন কর।" শিবানী চমকিত হইয়া গলবস্ত্রে বলিলেন, "মা! আমার একারই ভোগ্য হইবে, যুগলের নয়? মা বলিলেন, তোর স্বামী, তাহাকে ত বহুদিন পূর্ব্বে দর্শন দিয়াছি, সেত আমাকে বাঁধিয়া আমাময় হইয়াছে, তাহার জন্য ভাবিস্ না। পূজার সময় তোকে দেখা দিতে তোর প্রতিমাতে আমি আবির্ভাব হইব।"

শিবানী প্রাণের কথায় মনে-মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! কেমন করিয়া জানিতে পারিব? হৃদয়-দেবতা বলিলেন—সন্ধিক্ষণে পদ্মের পুষ্প স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিবে!

শিবানী হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে বলিলেন, মা! এ সমস্ত আয়োজন করিবে কে? আমি ত স্ত্রীলোক। দেবতা বলিলেন, চুনীর তীর্থবাস শেষ হইয়াছে; সে এখন গৃহাভিমুখে ফিরিয়াছে। দুই-একদিনের মধ্যে সে আসিয়া উপস্থিত হইবে; পান্নালাল গুরুর সহিত বহুদূরে, সে আসিতে পারিবে না। এই বলিয়া দেবী প্রাণের-প্রাণে লুকাইয়া পড়িলেন।

অতিরিক্ত মদ্যপান করিলে দেহ যেমন টলমল করিতে থাকে। **শিবানী** এই অপার্থিব স্বর্গীয় সুধাপানে ঘোর বিভোর হইয়া টলিতে-টলিতে গৃহে আসিলেন। বাটী আসিয়া দেখিলেন গৃহের দাওয়ায় আনন্দের হাট বসিয়াছে। **কমলকুমারী** বালকতিনটীকে লইয়া ভগবতীর স্তোত্র পাঠ করাইতেছেন; তাহারাও মধুরকণ্ঠে সেই মাতৃগাথা গাহিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমবেদনার অশ্রু

সেবা-ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। হিন্দু-শাস্ত্র ইহা তারস্বরে প্রকাশ করিতেছেন. কিন্তু প্রথমে আত্মসেবা অর্থাৎ আপনার শরীর রক্ষা, তার পর আত্মীয়-স্বজনের সেবা, তার পর পরসেবা—ইহাই বিধি, এইরূপ বিধানানুসারে কার্য্য করিলেই শ্রেয়ঃলাভ হয়। যাহারা আত্ম-বঞ্চনা করিয়া, অবশ্য-প্রতিপাল্য আত্মীয়-স্বজনের সেবা না করিয়া কেবল সমাজের নিকট সুনাম অর্জ্জনের জন্য পরসেবা করেন, তাহাদের ধর্ম্ম হয় না, বরং অধর্ম্মই উপার্জ্জিত হইয়া থাকে।

চুণীলাল বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, সংসার ত্যাগ করতঃ সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নানা দেশে, নানা জাতীয় অনাথ-আতুরের সেবা করিয়া এখন কাশীতে আসিয়া আপনার কার্য্য করিতেছিলেন, প্রাণ দিয়া পরসেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু বিগতকল্য মণিকর্ণীকার ঘাটে এক দণ্ডীর নিকট উপর্য্যুক্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়াছে; তিনি এখন বুঝিয়াছেন, যে যাহা

করিতেছেন, তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতি হইতেছে, ধর্ম্ম উপার্জ্জন না হইয়া চির-তরে অধর্ম্ম সঞ্চয় করা হইতেছে। বাস্তবিক যে আপনার এই দুর্লভ শরীরের প্রতি দয়ামায়াহীন, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি, বাল্যকালে যাহাদের দ্বারা পূর্ণমাত্রায় উপকার লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে ছাড়িয়া, সেবায় তাহাদের সন্তুষ্ট না করিয়া, যে পরের সেবা করিতে যায়, সে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিতেছে না কি? দণ্ডীর নিকট এই কথা শুনিয়া এইজন্য চুণীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে; পূজনীয় ভ্রাতা ও জননীসমা ভ্রাতৃজায়ার এবং স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রগুলির দর্শনে আবার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছে। সংসার কিছুই নহে, ইহার সবই অনিত্য; কেবল মায়ার খেলায় মানুষ বেহুস হইয়া ইহাতে মত্ত হইয়া পড়ে, ইত্যাদি নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ চিন্তা, যাহা এতদিন তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত করিতেছিল, এখন তাহা অপসৃত হইয়াছে। বড়-দাদা আমার জন্য কি না করিয়াছেন, আর বৌ-দিদি, যাহা করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা অসম্ভব, মানুষে যাহা পারে না; দেবীস্বরূপিনী বৌ-দিদি তাহাই করিয়াছেন। যদি সংসারে দাদা ও বৌ-দিদি না থাকিতেন, তাহা হইলে আমার অস্তিত্ব এতদিন কোথায় থাকিত, আর সংসার-বৈরাগ্যই বা কোথা হইতে উদয় হইত? ওঃ কি কুকর্ম্মই করিয়াছি; সংসারই ত সব, সংসার ছাড়িয়া ধর্ম্ম কেমন করিয়া হইবে। এই মায়াময় সংসারে মায়ার খেলার ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া দাদা ও বৌ-দিদি আমার অসহ্য কষ্ট, অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, আমাকে সে যন্ত্রণার তিলমাত্র ভুগিতে দেন নাই। সমস্ত বিপদ শির পাতিয়া আপনারা দুইজনে সহ্য করিয়াছেন। যখন

সুখের সময় হইয়াছে, সকলে অজস্র সুখভোগ করিয়াছে, দাদা ও বৌ-দিদি আমার সে ভোগে স্পৃহা-শূন্য ; দুঃখেও যেমন, সুখেও তেমন। হায়! আমি কি করিয়াছি, সুধা সিঞ্চন করিতে গিয়া গরল উৎপন্ন করিয়াছি! শুনিয়াছি বংশের অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবী পিতাকে স্বপ্ন দিয়াছিলেন, আমার খেলার সমস্ত ঘটনা তোর জ্যেষ্ঠপুত্র ও পুত্র-বধূ সহ্য করিবে, আমার পরীক্ষায় তাহারা বিশেষ ভাবে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবে। আর তোমার কনিষ্ঠপুত্র আমার দয়ায় বঞ্চিত হইয়া কেবল পশু-জীবন যাপন করিবে। এ দেববাক্যের ত এক তিল মিথ্যা নহে; আমি ত পশু অপেক্ষাও অধম! আর না, আর কোথাও থাকিব না, আর কোন কাজ করিব না, যতদিন জীবিত থাকিব, সেই দেবদেবীর পদতলে পড়িয়া, তাঁহাদের চরণামৃত পান করিয়া, পারি যদি কিছু ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিগে, নতুবা এ সকল বৃথা কাজে আমার মত পাষণ্ডের কোন ফললাভ হইবে না।

দম্পতীর পদধূলী গ্রহণ করিয়া চুণীলাল সেইদিন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন যাতায়াতের এত সুবিধা ছিল না, পদব্রজেই তীর্থ ভ্রমণ করিতে হইত; চুণী এখন কঠোরতা সহ্য করিতে বেশ পরিপক্ক হইয়াছেন। পূর্ব্বে আনন্দের দুলাল ছিল; যত অমানুষিক অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইয়া ভ্রাতাকে নিগৃহীত করিয়াছে, ভ্রাতৃজায়ার দুঃখের মাত্রা বাড়াইয়া আপনি পরম সুখে কাল কাটাইয়াছে। পার্থিব সুখভোগের চূড়ান্ত করিয়া, এখন বুঝিয়াছে—যাহা করিয়াছে, তাহাতে পাপার্জ্জন ভিন্ন আর কিছু হয়

নাই। তাই এখন সে বিলাসিতা, বাবুয়ানা ছাড়িয়া বৈরাগ্যের কোলে ঝাঁপ দিয়াছে।

চুনীলাল যতই গৃহাভিমুখী হইতেছেন, ততই তাঁহার মনে দাদা বৌ-দিদি, ও পুত্র-কন্যাগণের কথা উদয় হইতেছে, তাঁহারা কেমন আছেন, বিষয়-আশয় ত একপ্রকার যাইবার উপক্রম হইয়াছিল দেখিয়া আসিয়াছি? তাহারই বা কত কি আছে, কি অবস্থায়ই বা তাঁহাদের দিন কাটিতেছে; ইত্যাদি নানা বিষয় মনে উদিত হইয়া, তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্র উলটপালট করিতে লাগিল। তিনি দ্রুত গমনে দুইদিনের রাস্তা একদিনে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। অনাহার-অনিদ্রায় তাঁহার আর তত কষ্ট নাই, সেবা-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, তাঁহার এ সকল বেশ অভ্যস্থ হইয়াছে। দুই-একদিন পরে কোনও চটীতে আসিয়া কোন ভদ্রলোকের নিকট প্রার্থনা করিয়া কিছু আহারীয় দ্রব্য লইয়া থাকেন এবং তাহাই স্বহস্তে পাক করিয়া, জীবন-ধারণের মত আহার করেন।

চুনী আজ একমাস হইল কাশী ত্যাগ করিয়াছেন; যতই দিন যাইতেছে, ততই তাঁহার উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে, বাটী পৌছিবার জন্ম ততই তাঁহার প্রাণে একটা দারুণ পিপাসা জাগিয়া উঠিতেছে। তিনি ভাল পথ চলিতে পারিতেছেন না মনে করিয়া তিনি বড়ই ক্ষুন্ন হইতেছেন।

প্রায় দেড়মাসের পর তিনি শিবপুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু গ্রামের সে শ্রী-সৌন্দর্য্য না থাকায়, তাঁহার মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনের নাম তাঁহার জানা ছিল, তাঁহাদের বাটীতে যাইলেন। **রতন ঠাকু-**

য়ের কনিষ্ঠ পুত্র, পান্নালালের সহোদর বলিয়া, তাহারা তাঁহাকে আমল দিল না, চিনিয়াও যেন চিনিতে পারিল না। তখন তিনি হাটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ভাঙ্গা হাট, বেলা প্রায় ৪টা বাজিয়াছে। একজন দোকানদারকে পান্নালালের বাসস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ দোকানদার বহুদিনের পুরাতন পসারী—বেশ ধর্ম্ম-ভীরুলোক, ধার্ম্মিকপ্রবর পান্নালালের গৃহত্যাগের পর বিষয়-আশয়গুলা কিরূপ ফাঁকি দিয়া সকলে লইয়াছিল, তাহা সে বেশ জানিত, এইজন্য পান্নালালের কথা শুনিয়া, ধার্ম্মিকের পরিণাম ভাবিয়া, সে সজলনয়নে বলিল, "বাবা ঠাকুর! তাঁর কথা আর বলিবেন না, কথা মনে পড়িলেই আমাদেরও প্রাণ ফাঁটিয়া যায়, আহা! পাষণ্ডগুলা কি অধর্ম্ম করিয়াই সেই ধার্ম্মিকের বিষয়গুলা আত্মসাৎ করিল, তাঁহার ধর্ম্ম-পত্নীকে পথের ভিখারিণী করিল, তাঁহার অপগণ্ড শিশুগুলির মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল।" বলিতে, বলিতে বৃদ্ধ কাঁদিয়া আকুল হইল। চুণীলাল চিৎকার করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার তখনকার ভাব দেখিলে বোধ হয়, যেন দুঃখে তাঁহার হৃদয় ফাঁটিয়া যাইতেছে—তিনি বলিলেন, "বাপু! আর বেশী কিছু বলিতে হইবে না; তাঁহারা এখন কোথায় আছেন, এইটুকু বলিয়া দিয়া আমার উপকার কর!"

বৃদ্ধ বলিল, "তাঁহারা এখন গ্রামের উপকণ্ঠে যদুপতির সেই জীর্ণকুঠিরে অবস্থান করিতেছেন, বড় চাটুর্য্যে মশাই ধর্ম্মধর্ম্ম করিয়াই পাগল, অবস্থা মন্দ হইবার কিছু পূর্ব্বেই তিনি গৃহত্যাগী হইয়াছেন। এ সকলের বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানেন না। আর ছোট বাবুও তার পর চলিয়া গিয়াছেন, মশাই! ধর্ম্মধর্ম্ম করিয়া

এত বড় একটা বিপুল সংসার নষ্ট হইল। ধর্ম্ম করিয়া যে এরূপ অধঃপতন হয়, তাহা আমরা দেখি নাই। লোকগুলোর কি ভাল হইবে মশাই—উপরে যে একজন রাতদিনের কর্ত্তা আছেন, তাহা কি তাহারা মনে করে না?" বলিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে লাগিল।

ঠিক এই সময় একটী তিন-চারিবৎসরের বালক অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় দোকানে আসিয়া বলিল, "কর্ত্তামশাই! আধ পয়ছায় নূন দাও ত?"

বৃদ্ধ শশব্যস্তে বলিল, "এই, এই মশাই! বড় চাটুর্য্যে মশায়ের মেজ ছেলে দুর্গাপতি এসেছে; আপনি এদের বাটী যাবেন ত, এর সঙ্গে যান্।"

চুণীলাল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, উলম্ফনে "বাবা আমার কেমন আছিস রে" বলিয়া একেবারে গিয়া তাহাকে বাহুবেষ্টন করিয়া বুকের মাঝে টানিয়া লইলেন। বালক কিছু বুঝিতে পারিল না, সে ভয়-চকিত নেত্রে আগন্তুকের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

চুণীলালের চক্ষের জলে দর্শন শক্তিরোধ হইয়াছিল—উত্তরীয়ের দ্বারা নেত্রনীর মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "বাবা! আমি তোর হতভাগ্য কাকা, এতদিন তোদের ভুলিয়া বাহিরের ধর্ম্ম করিতে গিয়াছিলাম।"

দোকানদার চুণীলালকে বেশ চিনিত, তবে বহুদিন না দেখায় এবং পরিচয় না পাওয়ায় ভাল চিনিতে পারে নাই। এখন চিনিতে পারিয়া আসিয়া পদধূলী লইল। চুণীলাল বলিলেন, "পরাণ-দা! বাবাকে আমায় নূন দাও, আর কিছু চায়ত দাও।"

পরাণ। দুর্গা! এখনও বোধ হয় খাওয়া হয় নাই?

বালক। না কর্ত্তা মশাই! আমরা ত এই সময়েই খাই; সকালবেলা চারিটী পান্তা-ভাত মা-আমাদের সকলকে খাওয়াইয়া ভিক্ষায় যান। আজ কি জানি কেন ভিক্ষায় যাইতে পারেন নাই।

ওঃ আর না, দেবরাজ তোমার বজ্র কোথায়, এ কথা শুনিবার পূর্ব্বে আমার মস্তকে তাহা ফেলিলে না; রতন ঠাকুরের আদরিণী পুত্র-বধূ; ধার্ম্মিক চূড়ামণী, সত্য-কিঙ্কর পান্নালালের সহধর্ম্মিনীর আজ ভিক্ষা উপজীবিকা, এ সকল সোণার চাঁদ অপগণ্ড লইয়া তিনি দ্বারে-দ্বারে ফিরিয়া থাকেন! ধর্ম্ম! কে বলে তোমার ধর্ম্ম আছে; অথবা এ আমারই কর্ম্ম, আমার কর্ম্মদোষেই ইহাদের এত কষ্ট, ধর্ম্মের দোষ কি? এই বলিয়া চুণীলাল বালককে কোলে করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন।

কুঠিরের দ্বারদেশে যাইয়া "কৈ আমার দেবী, আমার মা কই"; তোমার পাপীষ্ঠ হতভাগ্য দেবর আসিয়াছে; দ্বার খুলো, আমারই কর্ম্মদোষে তোমাদের এত কষ্ট, দাদা ত আমার উপর শেষ অবস্থায় সংসারের ভার দিয়াছিলেন, কর্ত্তব্য-কর্ম্ম অবহেলা করিয়া, দেবতার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া আমি মহাপাপ করিয়াছি, ক্ষমা কর।

সেদিন দেবী-ভগবতী হৃদয়াভ্যন্তরে দেখা দিয়া যেরূপ বলিয়াছিলেন, সমস্তইত ঠিক, দেব-বাক্য কখন অন্যথা হইবার নয়। এইজন্য দেবরের প্রতীক্ষা করিয়া, আজ দুইদিন শিবাণী আর বাটীর বাহির হন নাই। যখন প্রাণের দেবর আসিতেছেন, তখন আর আমি কে, আর বাটীর বাহির হইব কেন?

হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া শিবানী শশব্যস্তে আসিয়া জীর্ণ-দরজার অর্গল মোচন করিয়া বংশের দুলালকে অন্দরে গ্রহণ করিলেন। চুণীলাল অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন, বলিলেন, "হায়! ভীষণ দরিদ্রতা যে দেবী প্রতিমাকে কালিমা-ময় করিয়াছে, বৌ-দি! তোমার সে সোণার দেহ এমন হইল কেন?

শিবানী। ভাই! সমস্তই মায়ার খেলা, আমার সে সৌন্দর্য্য যদি সমান ভাবে থাকিত, তাহা হইলে খেলার সফলতা কেমন করিয়া হইত; আমি সে রূপ লইয়া কোথায় যাইতাম? তাই প্রার্থনা করিয়াছিলাম—মা! যদি দরিদ্রতা দিলে ত এ রূপ বিরূপ কর, নতুবা বাটীর বাহির হইব কিরূপে, আর এখন আমার রূপেই বা আবশ্যক কি? মা! আমার সেকথা শুনিয়া আমাকে এইরূপ কুরূপা করিয়া দিয়াছেন; ব্যাধির প্রকোপে এইরূপ হইয়াছে। এই বলিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিতে লাগিলেন। চুণীলাল শিবানীর কথা শুনিয়া ক্ষোভে-দুঃখে মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন। তার পর দেবীর কৃপার কথা বিবৃত করিয়া বলিলেন, "ভাই! এ দরিদ্রতা আমাকে একদিনের জন্যও কষ্ট দিতে পারে নাই। তবে সেদিন বাৎসল্য-স্নেহে হঠাৎ এতই অভিভূত হইয়া পড়িলাম যে, বেটীকে দুকথা না শুনাইয়া থাকিতে পারিলাম না। তাই নিদয়া বেটী সদয়া হইয়া এই সাধের আশ্বিনে পূজার আয়োজন করিয়া দিয়াছে। ঠাকুর-পো! আর ত বেশী দিন নাই। তুমি পূজার আয়োজন কর।" চুণী হৃষ্টান্তকরণে মহামায়ার পূজার ব্রতী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পূজাগৃহে-সতী

দরিদ্রের বাটীতে আজ দুর্গাপূজার মহামহোৎসব, শিবানী ভিখারিণী, সে এবার দুর্গোৎসব করিবে, তাহার দেবর চুণীলাল আসিয়া, সমস্ত আয়োজন করিতেছে। আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেই শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল—হিংসায় ফাটিয়া মরিতে লাগিল, মনে করিতে লাগিল,—মাগী পূজার টাকা পাইল কোথা থেকে, তবে কি কিছু গুপ্তধন ছিল, অথবা চুণী কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে? মাগীর ভিক্ষা করা, তাহা হইলে কেবল লোক দেখান ভিন্ন আর কি হইতে পারে। পরাণ দোকানী শুনিয়া কিন্তু আহ্লাদে আটখানা হইয়া চুণীকে বলিল, "দাদা ঠাকুর! মা-ঠাকরুণকে বলিবেন, পূজার দ্রব্যাদি যেন আমার দোকান থেকেই যায়!"

চুণী হাসিয়া বলিলেন, "পরাণ দা! আমরাত চিরকালই তোমার খোদের আছি; তুমি ভিন্ন আর কাহার কাছে দ্রব্যাদি লওয়া হইবে না, বৌ-দি সেদিন আমাকে সে কথা বলিয়া দিয়াছেন, তুমিই সমস্ত দিও?

আশ্বিনমাস, দেবীপক্ষের চতুর্থী, পূজার আনন্দ প্রকৃতিরকোলে উথলিয়া উঠিয়াছে, ধরা সুখ-সৌন্দর্য্যে ভরিয়া গিয়াছে; সকলের প্রাণে একটা চিরপরিচিত পুলক আসিয়া, অতি বড় নিরানন্দকেও আনন্দিত

করিয়া তুলিয়াছে, চারিদিকেই আনন্দের উৎস, পৃথিবী ফলপুষ্পে ভরিয়া হাস্যময়ী হইয়াছে। দীন-ভিখারিগণ লোকের দ্বারে-দ্বারে আসিয়া মায়ের সেই প্রাণ-মাতান আগমনী সঙ্গীত "এবার আমার উমা এলে, আর তারে পাঠাবো না, লোকে করে করবে নিন্দে কারুর কথা শুনবো না" খোল করতাল সহকারে গাহিতেছে। কোথা বা দাশুরায়ের সেই কাতরকণ্ঠের কাতরোক্তি—"কে নাম দিলে ত্রিগুণ ধারিণী; কে নাম রেখেছে নিস্তারিণী। ওমা দুঃখের তরে তোরে হরে সঁপিলাম, হর হর কাল হর অবিরাম, কে দিলে মা তোর দুঃখহরা নাম, আমিত জানি দুঃখিনী।" শরৎ-কালের দেবীপক্ষে ভিখারিগণের কণ্ঠের এই সকল সঙ্গীত বাঙ্গালীর কাণে যে কি সুধাবর্ষণ করে, তাহা কথায় বলা যায় না। পূজা বাড়ী দেখিয়া কয়েকজন ভিখারী শিবাণীর নবনির্ম্মিত আটচালায় আসিয়া এই গানগুলি গাহিয়া প্রাণ মাতাইয়া দিল। দিন-ভিখারি-ণীর ঘরে আজ ভিক্ষুকেও ভিক্ষা লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল। ভিখারী-ঘরণী আজ রাজরাণী হইয়া যে শিবা-নীকে সদয়া হইয়াছেন, তখন এ জগতে সে আর কাহার অপ্রিয় থাকিতে পারে? তবে এ জগতে যাহার হৃদয় হিংসা-কালকূটে ভরা, ভগবান যাহাদিগকে কখন হাসিয়া কথা কহিতে দেন নাই, কেবল হিংসানলে পুড়িয়া-পুড়িয়া সারাজীবনটাকে অতিবাহিত করিতে দিয়াছেন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র?

পূজাবাটীতে কয়েকজন আত্মীয়-কুটুম্বের আবশ্যক, চুনী বৌ-দির অনুমতিক্রমে কয়েকজন আত্মীয়-কুটুম্বের নাম লিখিয়া তাহাদের নিমন্ত্রণের

ব্যবস্থা করিলেন, এবং বলিলেন, "বৌ-দিদি ! এ সময় প্রভাকে ত না আনিলে নয়।"

শিবানীর চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল, তিনি সদুঃখে বলিলেন, "ঠাকুর-পো ! সে কথা আর বলো না, প্রভার আমার অবস্থা বড় খারাপ, সেও আমাদের মত ঘোর দুঃখ ভোগ করিতেছে।" প্রভা বড়লোকের বৌ, তাহার অবস্থান্তরের কথা শুনিয়া চুণী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌ-দিদি ! কেন কেন, সে কিরূপ হইয়াছে !"

শিবানী বলিলেন, "ভাই ! সে অনেক কথা—তার শ্বশুরের বিষয় ত ছিল জানই, তোমার দাদাও আবার যৌতুক-স্বরূপ জামাইকে একখানি জমীদারী দিয়াছিলেন, তাহা ত তোমার অবিদিত নাই। জামাইটে এখন বেয়াড়া-বোম্বেটে হয়ে সে সমস্ত নষ্ট করেছে, কারুর কথা শুনে নাই, তার পর প্রভার প্রতিও যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করে, তবে তোমাদের বংশের মেয়ে ত, সে কিল খেয়েও কিল চুরী করে, মারিয়া ফেলিলেও স্বামীর নিন্দা করে না ; এখন তাহাদের বড় কষ্ট, বোধ হয় মায়ের আমার গহনাগুলিও যায়-যায়, তাহা হইলেই পথের ভিখারী—তার পর বাড়ীখানি ; জামাইটে ভয়ানক দাম্ভিক, গোঁয়ার-গোবিন্দ, কাহার মান রাখে না। শুনিয়াছি প্রভা আমার আসন্ন-প্রসবা ; তাহাকে আনিতেই হইবে, আমি ত বাবাজীর কাছে যেতেই পারতাম না, এখন আর ভাবনা নাই—তুমি আসিয়াছ।"

চুণী। মানুষের অদৃষ্ট ভাঙ্গা-গড়া না করিলে, অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত না হইলে, মায়া দেবীর খেলাঘর গুলজার হয় কই, নূতন নূতন লেখাত চাই ? আমাদের মেয়ে হয়ে বুঝি মায়ার খেলা

এবার তার উপরও পতিত হলো সে যাই হউক, কিন্তু বাটীতে পূজা,—একবার না গেলে কি ভাল দেখায় !

শিবাণী। যাইতে হইবে, বলিতেও হইবে, কিন্তু আমি মনে করেছি; পূজার সময় ত স্থানাভাব হইবে, সে অশক্ত, গর্ভবতীকে আনিয়া কেবল কষ্ট দেওয়া বইত নয়; এবার ত সময় অল্প বলিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ হইল না। তুমি যাইয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিবে, জামাইকেও আসিবার জন্য, দেখিবার শুনিবার জন্য অনুরোধ করিবে, তার পর তাঁরা যা বলেন। পূজার পরেই ত প্রসবের সময়—আনিতেই হইবে। মনে-মনে করিলেন—বেশী ব্যস্ত থাকিলে পূজা ভাল হইবে না।

চুণী। সেই ভাল, আমি যাইয়া বাবাজীর মন বুঝিব, প্রভাকে সমস্ত বলিব—যে হঠাৎ এইরূপ পূজার আয়োজন হইয়াছে, এবার মায়ের পাদপদ্মে গঙ্গাজল বিল্বপত্র দিয়া কাজ সারা হইবে, কারণ স্থান ত নাই। তার পর সে যেমন বলে, সেইরূপ করা হইবে, মেয়ে ত অবুঝ নয় ?

শিবাণী—সেই ভাল, বলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। চুণীলাল নিমন্ত্রণ করণার্থে বহির্গত হইলেন।

শিবাণী প্রত্যেক কাজ স্বামীর মত পবিত্রচিত্তে সমাহিত করিতেছেন। দেবতা নিকটে নাই, তথাপি যেন সকল কার্য্য তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া করা হইতেছে, আরাধ্য স্বামী-দেবতা তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়া, সমস্ত কাজ করাইয়া লইতেছেন। অন্যান্য বাটীর পূজা আর পান্নালালের পতিব্রতা-পত্নী শিবাণীর পূজায় পার্থক্য অনেক। এ পূজায় আড়ম্বর নাই;

লোক-দেখান কোন প্রকার আয়োজন হইতেছে না, বাদ্যোদ্যমের তেমন কিছু ব্যবস্থা নাই; তবে বাহ্যিক সাকারমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে হইলে যেটুকু আবশ্যক, ইহাতে তাহাই আছে; বেশীর ভাগ আছে—কাতরকণ্ঠে করুণাময়ীর করুণা ভিক্ষা, তাঁহার আবাহন,—মা-মা শব্দ, আর আছে—মাতৃনামে উচ্চরোল তুলিয়া প্রেমাশ্রু জলে বুক ভাসান, প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব; ইহা সাধারণ তামসিক পূজায় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। **শিবানী**ও যেরূপ ভক্তিমতী, আর **চুণীলাল**ও তদ্রূপ, ইহাদের পুত্রগণ যে এইরূপ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

কমলকুমারী অতীব বৃদ্ধা অশক্ত, **কর্ত্রী ঠাকু-রাণীর** ন্যায় মহানন্দে যতটুকু পারেন, মায়ের পূজায় ভক্তগণের সহিত ততটুকু যোগদান করিয়াছেন। যাহারা এ পূজা দেখিতে আসিতেছে, তাহারাই মোহিত হইতেছে। বলিতেছে, "এমন পূজা কখন দেখি নাই।"

পূজা ঠিক **রতন ঠাকুরের** কুলাচার অনুসারেই সমাহিত হইতেছে। ষষ্ঠীর দিন বিল্ববৃক্ষ-মূলে আমন্ত্রণাদি অধিবাস, তার পর সপ্তমীর দিন প্রথম পূজা। **শিবানী** আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া হৃদয়-মন্দিরে পতি-দেবতাকে আঁকিয়া রাখিয়া তাঁহারই উপর দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধ্যান স্তিমিত-নেত্রে ইষ্ট-চিন্তায় নিমগ্না; কখন-কখন চক্ষু উন্মীলন করিয়া মায়ের মূর্ত্তি প্রতি চাহিয়া-চাহিয়া অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। সপ্তমী গেল, মহাষ্টমীও শেষ হইলে সন্ধিপূজার আয়োজন হইল। দুর্গোৎসবের সন্ধিপূজা মাতৃভক্তের পক্ষে

বড়ই মনোরম, বড়ই হৃদয় উন্মাদকর। এ সময় বীজমন্ত্রে ভীমা চামুণ্ডার পূজা, ভক্ত হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া পূজাগৃহে মা যেন রণরঙ্গে নৃত্য করিতে থাকেন।

ধূপধূনা গুগ্‌গুলের গন্ধে গৃহ আমোদিত, ধূমে চারিদিক অন্ধকারময়, নীরব নিস্তব্ধ, সময়ে-সময়ে ভক্তগণের করুণকণ্ঠে সেই সুধামাখা মাতৃনাম উচ্চারণ; যে হিন্দু হইয়া হিন্দু-গৃহে এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে ইহার ভিতর কি ধর্মের মোহকরী, কি হৃদয়-উন্মাদকারী শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শিবাণী সেইদিনকার স্বপ্নকথিত মায়ের আদেশ মত, একদৃষ্টে মায়ের দক্ষিণ পাদপদ্মের প্রতি চাহিয়া আছেন, চক্ষে দর-বিগলিত ধারা বহিতেছে। পুরোহিত পূজায় রত, কর্ম্মকার বলিদানের জন্ত প্রস্তুত, ঠিক সময়ে কি দেখিয়া "জয় মা জয় মা" ধ্বনী করিতে-করিতে শিবাণী বলিলেন, বলিদান কর। বলিদান হইল—ঢাক ঢক্ক গম্ভীরে বাজিয়া উঠিল, "চল্ চল্ চল্‌রে তুই মায়ের কাছে চল্, পশুর জীবনমুক্তি হইল; পূজকের পুণ্যের অংশ লইয়া পশুর পশুপাশ বিমুক্ত হইল। তার পর মহানবমীর দিন হোমদক্ষিণান্ত ক্রীয়া সম্পন্ন করিয়া বিজয়ার মহামহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইল। যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইল, একবাক্যে বলিল, এমন দুর্গাপূজা আমরা আর কখন দেখি নাই।

পাঠক। বলিতে পারেন কি এ পূজা কেমন, এবং বিজয়ার স্থির সিদ্ধান্ত কি? ভক্ত চিরদিন মাকে ভিতরে দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, তাই সময়ে-সময়ে বাহির করিয়া সাকারভাবে

পূজা করে, পূজা শেষ হইলে হৃদয়ের ধনকে হৃদয়-সরোবরে লুকাইয়া যায় হয়—ইহাই বিসর্জ্জন, নতুবা নদী-হ্রদে মাকে ডুবাইয়া দেওয়া বিজয়া নহে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জামাতার কীর্ত্তি

পূজার আমোদের এখনও অবসান হয় নাই। এখনও সকলে মাতৃভাবে বিভোর। মা **শিবরাণী শিবানীর** পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। দরিদ্রের প্রতি মায়ের কৃপার সীমা নাই—তাই ত সাধক **তৃণাদপি সুনীচেন** হইতে চায়, অর্থাদি ভোগ-বিলাসের সামান্য আকাঙ্ক্ষা তাই ত তাহারা চায় না। এ সকলের আনন্দ আজ আছে কাল নাই—ইহার দ্বারা আজ বেশ আনন্দের হাসি হাসিলাম—কত সুখভোগ করিলাম—কিন্তু পরক্ষণেই কত কাঁদিয়া-কাঁদিয়া দুঃখের সাগরে সাতার দিতে হইবে। ধর্ম্মের আনন্দে—মাতৃ-পূজার আনন্দে হ্রাস-বৃদ্ধি নাই;—যে লাভ করিয়াছে, সে সদাই সমভাবে অবস্থিত।

শিবানীর হৃদয়ে আর দুঃখের নামমাত্র নাই; ভবের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টে জয়লাভ করিয়া, এখন আনন্দময়ীর আনন্দ-পানে বিভোর, তাঁহার শিশু-পুত্রগণও সকলে আনন্দিত, **কমল-কুমারীও** পূজায় অসীম আনন্দ লাভ করিয়াছেন। আর **চুণীলাল** তাহার ত বহুদিন পূর্ব্বে হৃদয় গঠন হইয়াছে—প্রাণ

একপ্রকার তন্ময় হইয়াছে। তাহার আনন্দ শিবাণীর মত না হইলেও তিনি যে আনন্দে ভরপুর হইয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। একদিন সকলে বসিয়া, পূজার কথা কহিতেছেন—সে স্মৃতি ত এখন যায় নাই। মনের মধ্যে তাহা এখনও যে জাগিয়া রহিয়াছে।

কমলকুমারী বলিলেন, "পূজার আনন্দ কিন্তু সম্পূর্ণ হইল না, কারণ সকলে আসিল—আনন্দ করিল, আহা প্রভা আমার দেখিতে পাইল না, জামাইটে কি মূর্খ—একদিনের জন্য পাঠালে না গা!" শিবাণী বলিলেন, "ঠাকরুণ। আমরাও তাহাকে আনিবার জন্য তত জেদ করি নাই; সে এখন আসন্নপ্রসবা—নড়িতে পারে না, তাহা উপর এই স্থানাভাব, অত্যন্ত কষ্ট হইবে বলিয়া ঠাকুর-পো জামাইকে বেশী অনুরোধ করেন নাই। এইবার তাহাকে দুই-চারিদিনের মধ্যে আনা হইবে।"

পূজার সময় প্রতিবেশীর বাটী হইতে কোন-কোন তৈজসপত্র চাহিয়া আনা হইয়াছিল, সেইদিন প্রাতঃকালে চুণীলাল সমস্ত যথাস্থানে দিয়া আসিতেছেন; শিবাণী সেই সকল নীরথ করিয়া দিতেছেন। বৃদ্ধা কমলকুমারীর নিকট দাওয়ার উপর বালকগুলি বসিয়া, তাঁহার দন্তবিহীন-বদনের কথা শুনিয়া হাসিতেছে। এমন সময় কে একজন বাহির হইতে বলিল, "হ্যাগা। পান্না-লাল চাটুর্য্যের স্ত্রী-পুত্র কি এই বাটীতে থাকেন?" চুণী-লাল শশব্যস্তে দ্বারদেশে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ মশাই; এখানেই থাকেন, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?

আগন্তুক। আমি তাঁহার বেহাইবাটী হইতে আসিতেছি আপনারা শীঘ্র তথায় যান, সুশীল তাহার স্ত্রীকে এমন প্রহার করিয়া রক্তারক্তি করিয়াছে, যে আর তাহার বাঁচিবার আশা নাই।

দ্বারের নিকটেই কথা হইতেছিল। শিবানী শুনিতে পাইলেন বলিলেন, "ঠাকুর-পো! এ কি?"

চুনী। কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না, বৌ-দি! তাহাদের বাটীতে স্ত্রীলোক কেহ নাই। এখন বেইবাটী যাইবার আপত্তি করিলে চলিবে না। তুমি ভবানীকে সঙ্গে করিয়া শীঘ্র যাও, আমি কবিরাজকে সঙ্গে করিয়া এখনি যাইতেছি।

কেহই আর কাল বিলম্ব করিলেন না। শিবানী উর্দ্ধশ্বাসে পুত্র-সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চুনী কবিরাজ মহাশয় সহ উপস্থিত হইলেন, তখন দেশে কবিরাজী চিকিৎসারই প্রাদুর্ভাব ছিল। তাঁহারা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহিবাটী লোকেলোকারণ্য; পুলীশ আসিয়া সুশীলকুমারকে ঘেরিয়াছে। প্রভার চৈতন্য নাই—তাহার মুখের কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই বলিয়া, তাহারা এখনও সুশীলকে গ্রেপ্তার করে নাই।

শিবানী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন দেখিলেন, প্রভাবতী আভাহীন হইয়া ধূলায় পড়িয়া আছে; সোণার কমল রক্তাক্ত কলেবরে অচৈতন্য, একটী যুবতী তাহার মস্তক কোলে লইয়া বসিয়া আছে। সে সুন্দরী হইলেও তাহার রূপে কোন জ্যোতি নাই, যেন ভীষণ পাপে তাহার লাবণ্য হরণ করিয়াছে। শিবানী

যাইবামাত্র সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মাতা পুত্রীকে কোলে লইয়া বসিলেন, কবিরাজ আসিয়া ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিল। রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া দিল। সসত্ত্বা অবস্থায় অতিশয় রক্তপাতে দেহ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে—রোগীর চৈতন্য নাই। অনেক সেবা-শুশ্রূষার পর প্রভা চক্ষু মেলিয়া চাহিল। জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভয় কি মা! আমি আসিয়াছি। এখন কেমন আছ?"

প্রভাবতী চক্ষু মেলিয়া বিস্ময়াবিষ্ট অন্তঃকরণে বলিল, "অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। মা আসিয়াছ; একটু ভাল আছি মা, যখন তুমি এসেছ, তখন আর ভয় কি?" কবিরাজের ঔষধে রক্ত বন্ধ হইয়াছে—বলকারক পথ্য পড়িয়াছে, রোগীও একটু সুস্থবোধ করিয়াছে। মায়ের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া প্রভা একবার এ দিক ও দিক চাহিল—মাথা তুলিয়া দেখিল, যেন কাহাকে দেখিতে চায়!

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাও মা, কাহাকে খুঁজিতেছ?

প্রভা বলি-বলি করিয়া, যেন মাতার নিকট বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল।

মাতা বলিলেন—মা, লজ্জা কি, কি চাই বল। সেই পাংশুবর্ণ মুখমণ্ডলের মাঝে কোটরগত চক্ষুদুইটী বুজিয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "মা, তিনি কোথা? ও কিসের গোলমাল?"

জননী। বাহিরে শুনিতেছি, পুলীশ আসিয়াছে; সুশীলকে আটক রাখিয়াছে, মা! সত্য বল সুশীল কি করিয়াছে।

প্রভা। তাঁহার পদাঘাতে পড়িয়া গিয়া আমার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে; বিপক্ষ প্রতিবাসিগণ এই অছিলায় তাঁহাকে কারাবদ্ধ

করিতে চায়—তাহারাও চরিত্রদোষে অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিয়া এখন সময় পাইয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। যখন আমি অচৈতন্য হইয়া পড়ি, তখন গোলমাল শুনিয়াছিলাম। মা! তাঁহাকে বাঁচাও, নতুবা আমার এ জীবনলাভ বৃথা; পরে **চুণীলালের** দিকে ফিরিয়া **প্রভা** অতি ম্লানমুখে বলিল, "কাকা; ইহার কি কোন উপায় নাই?"

চুণী। মা! ভয় কি, **সুশীলকে** বাঁচাইতে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব, তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার দোষ সমস্ত অস্বীকার করিও, তাহারা এইবার তোমায় জিজ্ঞাসা করিবে।

প্রভাবতী একটু সুস্থ হইয়াছেন, শুনিয়া পুলীশ পর্দ্দার আড়ালে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! তোমার স্বামী কি তোমাকে মারিয়াছিলেন? এরূপ রক্তারক্তি হইবার কারণ কি?"

প্রভা ক্ষীণ অথচ উচ্চকণ্ঠে বলিল, "ভদ্র-গৃহস্থের পুরুষ কখন স্ত্রীর গায়ে হাত তুলিতে পারেন না, এ কথা সমস্ত মিথ্যা; তিনি তখন বাটীতে ছিলেন না; অসাবধানে পড়িয়া গিয়া আমার এরূপ হইয়াছে।"

তার পর পুলীশ **শিবানীকে** তাঁহার জামাতার চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, "তিনিও সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া জামাতার দোষক্ষালন করিলেন।"

চুণীলালের সহিত পুলীশ-কর্ম্মচারীর খুব হৃদ্যতা ছিল, **চুণীও** প্রতিবাসীর ষড়যন্ত্রের কথা বুঝাইয়া দিলেন বলিলেন, "এরূপ কার্য্য **সুশীলের** দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব; তবে

বড়লোকের ছেলে, পাড়ায় নানা কারণে তাহার বিপক্ষ লোক থাকিতে পারে—তা ব'লে যে সে, তাঁহার স্ত্রীকে খুন করিতে গিয়াছিল, এ কথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।"

পুলীশ জবানবন্দী লইয়া চলিয়া গেল—সুশীলকে কোন প্রকারে দোষী করিল না। নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত আচরণ স্ত্রীর উপর আচরিত হইল, প্রভা একপ্রকার মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিল—তথাপি দুর্বৃত্ত স্বামীর তিলমাত্র দোষ কাহাকেও জানিতে দিল না। ইহাই না অনুরাগ—ইহাই না আপন ভুলিয়া স্বামীর প্রতি ভালবাসা! মাতা-পুত্রীর হৃদয় যে কোন কমনীয়-উপাদানে গঠিত, তাহা স্থির করা যায় না! ধার্ম্মিকহৃদয়ের কোমলতা, প্রশস্ততা এমনি অবর্ণনীয়! সীমাবদ্ধ অস্থি-পিঞ্জরের মধ্যে থাকিয়াও ইহার সরলতা অনন্ত, কোমলতা অসীম; ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পবিত্রভাবে ইহা ভরপুর—হৃদয়ের এই অসীমত্ব আছে বলিয়াই ত তাঁহারা দেবী অংশসম্ভূতা, দেবীরূপে সর্ব্বত্র পূজিতা।

প্রতিবাসী সকলে পাপাচারী সুশীলকে ঘোর-বিপদে ফেলিয়া সর্ব্বনাশ করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহা নিষ্ফল হইল দেখিয়া, সকলে বিরস বদনে একে-একে সেস্থান ত্যাগ করিল; অন্তরে দারুণ রোষানল প্রজ্বলিত হইলেও প্রভাবতীর স্বামী-ভক্তি দেখিয়া, সকলে অবাক হইয়া গেল। এইবার সুশীল-কুমারের অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইল, অনুতাপ আসিয়া তাহার পাপ-হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাকে জ্বালাইতে লাগিল। তাহার প্রতি তাহার পুণ্য-প্রতিমা বণিতার অনুরাগ দেখিয়া মর্ম্মদুঃখে

কাঁদিতে লাগিল। সে একটা মায়াবিনী বারবণিতার বশে কি ভয়ানক দুর্দ্দৈব ঘটাইতে গিয়াছিল; জগতের কি পরমধনকে সে কালের কোলে ডালি দিতে অগ্রসর হইয়াছিল? ওঃ কি ভয়ানক মোহ তাহাকে ঘেরিয়া এই বিষম পাপ-কাজে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। ভগবান! না কি সত্য আছেন; একান্তমনে যে পতিপূজা করে, এ জগতে তাহার নাকি অপমৃত্যু সংঘটন হয় না, তাহা দেখাইবার জন্য বিধাতার এ লীলাখেলা কিন্তু আমি সে সতীর পবিত্র মূর্ত্তির নিকট আর দাঁড়াইব কেমন করিয়া, আমি পিশাচ অপেক্ষাও হীন, অধমেরও অধম—মহাপাপী। **সুশীল** এই সকল কথা বলিতেছেন, আর কাঁদিয়া-কাঁদিয়া চক্ষু জলে বক্ষঃ প্লাবিত করিতেছেন। গৃহ-অর্গল বদ্ধ।

পাপিনী **বিমলাসুন্দরী সুশীলকে** উত্তেজিত করিয়া অর্থসংগ্রহের পরামর্শ দিয়াছিল; প্রহারের পর অজস্র রক্তস্রাবে **প্রভাকে** কোলে করিয়া, তাহার কিরূপে মৃত্যু হয়, তাহা দেখিতে-ছিল—কিন্তু যেমন **শিবানী** আসিলেন, অমনি আর থাকিতে পারিল না—পলায়ন করিল। পাপ পুণ্যের নিকট এইরূপেই অবনত হইয়া পলায়ন করে।

বহুচেষ্টা করিয়া **চুণীলাল সুশীলকে** গৃহ হইতে বাহির করিলেন। সে, বাহির হইয়া কেবল হা-হুতাশ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এবং কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?"

শিবানী পুত্রসম **সুশীলের** পরিবর্ত্তন দেখিয়া বলিলেন, "বাবা! একটা কি ভয়ানক কার্য্য করিয়াছিলে দেখ দেখি; ইহার

আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত কি আছে; তুমি খুব আদর্শ চরিত্র হইয়া প্রভাকে খুসী করা ভিন্ন এ দোষ ক্ষয় সাধনের অন্য উপায় কিছুই নাই।” পুত্র কোন ভয়ানক দোষ করিয়া নত হইলে, মা যেমন তাহাকে কোলে করেন, শিবানীও তদ্রূপ করিলেন। চুণীলাল কোমল অথচ কঠোরভাবে কত উপদেশ প্রদান করিলেন। সুশীল বিরুক্তি করিল না, কেবল বলিল, “আপনারা পূর্ব্বের ন্যায় আমার পশ্চাতে থাকিয়া সংসারের কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা দিন। আপনারা সেই বনালয় ছাড়িয়া এখানে অবস্থান করুন।” শিবানী দেখিলেন,—কথাটা অনেক অংশে সত্য; সুশীলের পিতৃমাতৃ-বিয়োগের পর তিনি (পান্নালাল) ছিলেন—উহাকে চক্ষেচক্ষে রাখিয়াছিলেন, তাঁহার গৃহত্যাগের পর হইতে ত আর কেহ উহাকে দেখে নাই। অপরিণতবয়স্ক-যুবক অর্থের আধিক্য হেতু অসৎপথে গিয়াছে; ধনে যেমন মানুষকে ভাল করে, মন্দও যে ততোধিক করিয়া থাকে; সংসারানভিজ্ঞ বালক সুশীলের দোষ কি, দুর্ব্বৃত্তগণ যেমন নাচাইয়াছে, সে তেমনি নাচিয়াছে,—আপনার সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াছে, সঙ্গে-সঙ্গে পরকাল নষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে স্ত্রীকে মারিয়া উহার যেরূপ অনুতাপ আসিয়াছে, ভাল হইয়া, পাঁচজনের একজন হইবার জন্য যেরূপ আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহাতে সাবধানে চালাইলে সুশীল এখন সহজেই সৎপথগামী হইতে পারে। শিবানী চুণীলালের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, ঠাকুর-পো, উপায় কি?”

চুণীলাল বলিলেন, “সুশীলকে সঙ্গে-সঙ্গে করিয়া কিছুদিন না চালাইলে এ সংসার-সমুদ্রে সে, এমনি করিয়া

বানচাল হইবে, তরঙ্গ ভীষণ হইলে ডুবিয়া মরিবারও সম্ভাবনা। তুমি কি আমাকে ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বল ?"

শিবানী। তা না হইলে, এখন আর কে আছে, নিজের জিনিস নিজে না দেখিলে, আর কে দেখিবে; এরূপ করিয়া নষ্ট হইবে কি? আর এরূপ করিয়া একটী সংসার পাতিয়া দেওয়াও যে অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম এবং মহাধর্ম্ম—সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

স্থির হইল, **চুণীলাল** ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে লইয়া এখানেই থাকিবেন, **শিবানী** জামাতৃ-গৃহে কখনই বাস করিবেন না, বুড়ীর জীবদ্দশা অবধি তাঁহাকে লইয়া, সেই বনালয়েই থাকিবেন। **সুশীল ও প্রভাবতী** যেন হাতে স্বর্গ পাইল—কাকার মত একজন বিচক্ষণ লোক তাহাদের অভিভাবক হইয়া থাকিলে, আর ভাবনা কি? প্রাণের সোদরগুলিও **প্রভার** নিকটে থাকিবে—ইহার তুল্য আনন্দ আর কি আছে?

সুখ্যাতি অপেক্ষা অখ্যাতি শীঘ্র চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়ে। **সুশীলের** এ কলঙ্ক চারিদিকে প্রচার হইলে তাহার বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা করা দয়া হইল, ইহা এক প্রকার **শাপে বর** বুঝিতে হইবে। ধনীর পুত্রকে পাইলে বন্ধুগণের কত প্রকার খেয়ালে মস্তিষ্ক আলোড়িত করে, তাহা ত বলা যায় না। **সুশীল** বাড়ী হইতে আর বাহির হন না—**ধর্ম্মশীল চুণীলালের** নিকট সৎ-উপদেশ পাইয়া ধর্ম্মভাবে জীবন গঠন করিতে লাগিলেন। পাকা হাতে পড়িয়া **সুশীলের** জমীদারীর আবার শ্রী ফিরিল। **ভবানী-পতি, দুর্গাপতি ও উমাপতি** এতদিন বিদ্যালয়ে যায়

নাই। এক্ষণে খুড়া মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়া বেশ লেখাপড়া শিখিতে লাগিল।

ঠিক দশমাস দশদিনে **প্রভাবতী** বিনাকষ্টে একটী **সুকুমার** প্রসব করিলেন। কত লোকে সন্দেহ করিয়াছিল; সকলেই বলিয়াছিল,—এরূপ ভয়ানক রক্তমোক্ষণের পর **প্রভার** গর্ভের নিশ্চয়ই অনিষ্ট হইবে। ভগবান কিন্তু সুপ্রসন্ন হইয়া জনকজননীর সে আনন্দে বাধা দিলেন না। পুত্র-মুখ নিরীক্ষণ করিয়া **প্রভার** আনন্দের সীমা রহিল না; পিতামাতার ত আনন্দ হইবেই। যে শুনিল সেই বলিল, "আহা! বংশরক্ষা হউক!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পুরুষোত্তমের পথে

জগতের কৃত্রিম আশা-বাসা ভাঙ্গিয়া যে আত্মস্থ হইতে পারিয়াছে, **মায়ার খেলা** আর তাহাকে লইয়া অন্য জনের মত কুহক-কৌতুকে মাতাইতে পারে না, জাগতিক ধূলাখেলা আর তাহার নিকট ভাল লাগে না। যে খেলা নিত্য—যে খেলা খেলিলে, মন-প্রাণ একেবারে মোহিত হইয়া, আত্মানন্দে ডুবিয়া যাইবে—প্রাণের সেই খেলা এখন তাহার খেলার বস্তু। **শিবানীর** মায়াঘোর কাটিয়াছে—পার্থিব সকল বিষয়ের পরিতৃপ্তি সাধিত হইয়াছে, তাই এখন আর তাঁহার কোন সাধ নাই; কেবল পুরুষোত্তমে

জগৎ স্বামীর পদতলে তাঁহার প্রাণের দেবতার সহিত মিলিত হইতে পারিলেই, সতী ইহজীবন ধন্য বলিয়া মনে করেন।

সুশীল এখন সুশীলসম্পন্ন হইয়াছেন; সাধকোত্তম **চুনী-লালের** সদুপদেশে জামাতার মতি-গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; পুত্রতিনটী বেশ লেখাপড়া শিখিতেছে। একটী কাঁচের পুতুলের মত সুন্দর শিশু **প্রভাবতীর** কোলজোড়া হইয়া প্রাণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে দেখিয়া **শিবানীর** সকল ভাবনার অন্ত হইয়াছে। **কমলকুমারীর** ভাবনা সকল ভাবনার বেশী হইয়া **শিবা-নীকে** সময়ে-সময়ে অত্যন্ত কাতর করিয়া তুলিত। পতি-পুত্রহীনা দুঃখি-নীর সদ্গতি কেমন করিয়া হইবে,—কেমন করিয়া তিনি সুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন, এই ভাবনাই তাঁহার অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল; এইজন্য তিনি বাটী ছাড়িয়া কোথাও যাইতে সাহস করিতেন না। ভগবান এক্ষণে তাঁহার সে ভাবনা বিদূরিত করিয়াছেন; আজ চারিমাস হইল, **কমলকুমারী** সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। পারত্রিক ক্রিয়াকলাপও সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; তবে আর ভাবনা কিসের? এইবার তাঁহার বহুপূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্নের ভাবনা—মা ভগবতী তাঁহার অন্তরে প্রতিভাত হইয়া যে সকল প্রাণের কথা, পুরুষোত্তমে মহামিলনের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে সতত তাহাই তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়া, প্রাণকে উৎফুল্ল করিতে লাগিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, ভগবানের রথযাত্রার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, **শিবানীর** প্রাণ ততই উদ্বিগ্ন অথচ আশান্বিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। দেবী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,

রথযাত্রার সময় সকল তীর্থ দর্শন শেষ করিয়া তীর্থের সার পুরুষোত্তমে তোমার প্রাণের দেবতার আবির্ভাব হইবে—তিনি শ্রীগুরুদেব সহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তবে আর কেন, সেদিনের ত আর বেশীদিন বাকী নাই; দেবরকে একবার এ বিষয় জানান আবশ্যক; স্বামীর কনিষ্ঠ তিনি, ধর্ম্মেকর্ম্মে তিনিও বড় কম নহেন। এ বিষয়ের কথা তাঁহাকে বলিয়া যাওয়াই ভাল, যখন যাইব আর ফিরিব না, যখন দেবতার পদে মিশিব, আর আসিব না—ইহা স্থির, তখন আত্মীয়-স্বজনের মত লইতে দোষ কি? যখন আত্মস্থ হইয়াছি, প্রতিজ্ঞা যখন দৃঢ় হইয়াছে—যাইব, মা যখন আদেশ করিয়াছেন যাইতে; তখন আর ফিরায় কে, জগতের কোনও মায়া-মমতা কি আর এ প্রাণের টানে বাধা দিতে সমর্থ হয়? এ তীর্থ যে সর্ব্বার্থসার-তীর্থ—কলির মহা তীর্থ, কামনা-বাসনা, মনের নীচ কল্পনা থাকিতে এ তীর্থ দর্শনে কোন ফললাভ হয় না। নিষ্ক্রিয় না হইলে, ত্যাগে হৃদয় পূর্ণ না হইলে, সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান সঞ্চার না হইলে যে এ তীর্থে গমন মিথ্যা, ভ্রমণে কোন লাভই যে হয় না, তাই এ স্থানের দেবতার হাত-পা নাই, যাইবার ও করিবার কিছু নাই বলিয়াই ওঁ পুরুষোত্তমের দেবতা হস্ত-পদবিহীন। সকল বস্তুতেই ব্রহ্মভাব বলিয়াই ত ইহার মন্দিরের চারিধারে এত বীভৎসভাবপূর্ণ আলেখ্য সুসজ্জিত; যাহার মন মনোময়ে অর্পিত, যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ তিনিই এই তীর্থের যাত্রী—অন্যে নহে।

তখন শ্রীক্ষেত্র যাইবার রাস্তা এত সুগম ছিল না; এখনকার মত যানাদি তখন আবিষ্কৃত হয় নাই; পদব্রজে এই দুর্গম পথ

অতিক্রম করিয়া তবে দেবদর্শন করিতে হইত, তাই তখন এ ক্ষেত্রে যাত্রী হইলে, এ তীর্থে যাইবার মনস্থ করিলে বাটীতে কান্নাগোল উঠিত, যাত্রী আর গৃহে ফিরিবে না বলিয়া সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইত। বিষয়াপন্ন নরনারী বিষয়-সম্পত্তির উইল করিয়া গমন করিতেন। বাস্তবিক তখন ইহা এইরূপ দুর্গমই ছিল, আর এইরূপ দুর্গম এবং ভীষণ-কষ্টসাধ্য ছিল বলিয়াই এই তীর্থ-মাহাত্ম্য তখন এত মহিমাময় ছিল। ভক্তমাত্রেই তখন মনেপ্রাণে দেবদর্শনে গমন করিয়া সফলকাম হইতেন। যাহাতে কষ্ট বেশী, সুখ তাহাতে ততোধিক; যাহা অনায়াসসাধ্য তাহাতে লাভের মাত্রা অতিকম, নাই বলিলেই হয়।

একদিন বৈশাখমাসের প্রখর-মধ্যাহ্নে **চুণীলাল** মুন্সী-গঞ্জ হইতে বাটী আসিয়াছেন। **শিবাণী** পুত্র-কন্যার এবং প্রাণের দৌহিত্র ও জামাতার কুশল-সংবাদ লইয়া **চুণীকে** আহারাদি করাইলেন, নিজেও আহারাদি করিয়া নিশ্চিন্তে দাওয়ায় বসিয়া দেবরের সহিত নানা প্রসঙ্গ করিতেছেন।

চুণীলাল বলিলেন, বৌ-দিদি—**প্রভা** বলে—মা, কেন সেই বনালয়ে একাকী থাকেন; এখানে আসিয়া থাকিলে কি আর জাতি যাইবে, এখন ত অনেকেই জামাইবাড়ী থাকিতেছে। জামাই অভিভাবকহীন হইলে আর উপায় কি?

শিবাণী হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, তা বটে কিন্তু আমি আর থাকিব কতদিন?"

চুণীলাল চমকিত হইয়া বলিলেন, "কেন; বৌ-দি এ কথা বলছো!"

শিবানী। এই রথের সময় আমি পুরুষোত্তম যাইবার মনস্থ করেছি, ঠাকুর-পো! তোমাকে জিজ্ঞাসা করবার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। পাড়ার সকলে যাচ্ছে—এবার কালশুদ্ধ আছে, আমিও যাব। তবে তোমাকে না বলে ত যেতে পারি না?

সহসা সর্পদংশন করিলে, মানুষ যেমন লাফাইয়া উঠে, **চুনী-লাল** তদ্রূপ চমকিতভাবে গৃহের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "বৌ-দি! এ তীর্থ দর্শনে তোমাকে আবার কে নাচাইল; এ কি সহজ তীর্থ, এ যে জীবন-মরণের পথ, তুমি বল কি?"

শিবানী। হাঁ ভাই! আমি সকলের নিকট মত দিয়া ফেলিয়াছি, তবে তোমাদের মত না লইয়া ত কাজ করিতে পারি না। তাই তোমাকে বলিলাম।

চুনী। বৌ-দি! যদি আমার মত একান্ত চাও; তাহা হইলে আমি কিছুতেই ইহাতে মত দিতে পারি না। সেখানে যাইলে আমরা নিশ্চয়ই মা-হারা হবো? সে কষ্ট তুমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না—সে পথ অতি দুর্গম।

শিবানী। প্রাণের টান থাকিলে পথ সুগম হইবে, কোনও কষ্ট হইবে না।

চুনী। কিন্তু কথা শুনে অবধি আমারই প্রাণ যেন কেমন কেমন কচ্ছে, ছেলে-পিলেরা এ কথা শুনলে কি করবে বল দেখি?

শিবানী। তা বলে আর কি হইবে; তুমি কোন রকমে সান্ত্বনা করে রেখো, আমাকে আর এ পথে বাধা দিও না।

চুণী। যদি একান্তই যাবে, তাহা হইলে আমিও সঙ্গে যাব; আমার কষ্ট সহ্য করা তোমার চেয়েও অভ্যাস আছে?

শিবানী। তাতে ক্ষতি কি, তবে তাহাদের বুঝাইয়া প্রস্তুত হও!

চুণী। সে আজই হবো, আচ্ছা,—বৌ-দি! জীবনে তুমি ত কখন তীর্থের নাম করো নাই; যখন সময় ভাল ছিল, দাদা কাছে ছিলেন, তখন ত ইচ্ছা করিলে, কত তীর্থ ভ্রমণ কর্ত্তে পারতে; এখন হঠাৎ এ মতি হলো কেন; তোমার পক্ষে এ যে অতি আশ্চর্য্যের বিষয়?

শিবানী চুণীর নিকট আর কোন কথা গোপন করিতে পারিলেন না। **পান্নালালের** গৃহ-বর্হিগমন-সময়ের আদেশ এবং তার পর সেদিন **জগজ্জননী মহামায়ার** স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্ত একে-একে বিবৃত করিলেন; শুনিয়া **চুণী** আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রাণের অগ্রজের দর্শন না পাইয়া **চুণী** এতদিন জীবন্মৃত হইয়াছিল, পুরুষোত্তমে তিনি আসিয়াছেন—যাইলেই দেখা হইবে; বহুদিনের পর শিবশক্তির মহামিলন দেখিয়া ধন্য হইবেন—ইহাতে কোন ভ্রাতৃভক্ত কনিষ্ঠভ্রাতার আনন্দসাগর উথলিয়া না উঠে?

চুণীলাল মুন্সীগঞ্জে গমন করিয়া **প্রভা, ভবানী দুর্গা, উমা ও সুশীলকে** সমস্ত বলিলেন, বাপ গিয়াছেন, তাঁহার এখন সন্ধান নাই; মা যাইলে কি আবার এরূপ হইবে? **প্রভা** শুনিবামাত্রই চিৎকার করিয়া উঠিল; **ভবানী** কাঁদিতে

লাগিল। চুণীলাল বলিলেন, "মা! কেঁদো না, তাঁহাকে একাকী ছাড়িয়া দিব না, আমি সঙ্গে যাইব।"

কাকা অনেক তীর্থ বেড়াইয়াছেন, অনেক দেশে গিয়াছেন; তিনি সঙ্গে থাকিলে আর ভয় কি? সকলে আশ্বস্ত হইল। পুত্র কন্যা, জামাতা, জননীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন।

শিবাণী প্রাণের পুত্রতিনটীকে ভগ্নী ও ভগ্নিপতির অনুগত হইয়া থাকিতে বলিলেন। সুশীলকে খুব যত্নের সহিত স্নেহ সহকারে বলিলেন, "বাবা! এখন তুমিই ইহাদের ভরসা, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে থাক?"

সুশীল সজল-নেত্রে বলিলেন, "মা! আপনার কৃপায় আমার মোহঘোর কাটিয়া গিয়াছে, আর বিপদে পড়িব বলিয়া বোধ হয় না আপনার কৃপায় এখন সংসারের সমস্ত কুটীলতা বেশ বুঝিতে পারিয়া সাবধান হইয়াছি; যেন: এই সাবধানতা চিরকাল থাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন?"

শিবাণী সকলের মস্তকে পদ্মহস্ত প্রদান করিয়া শেষ আশীর্ব্বাদ করিলেন। স্বর্গের দেবদূত সদৃশ দৌহিত্রটীকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন, তার পর পুত্রগণকে শেষ আলিঙ্গন করিয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন, মায়ার মোহ কাটিয়া গেল, আর ফিরিয়া চাহিলেন না। সন্তোষ ও বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে সতী-সীমন্তিনী "জয় জগন্নাথ" বলিয়া প্রাণনাথের উদ্দেশে বাহির হইলেন।

পতি ভিন্ন স্ত্রীলোকের অন্য দেবতা নাই। শিবাণী পতি-দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতা জানেন না, ও মানেন না। তিনি সকল

দেবতার মধ্যেই তাঁহার আরাধ্য বস্তু পতির দর্শন পান; হৃদয়ের প্রত্যেক স্তরে-স্তরে সেই পান্নালালের সৌম্য ঋষিমূর্ত্তি জাগরিত। আজ জগন্নাথের রথে তাহার প্রাণনাথের দর্শনলাভ জন্য পুরুষোত্তমে যাইতেছেন, মহামিলনে মিলিয়া এক হইবেন, সৎচিৎ আনন্দের সহিত উভয়ে মিশিয়া সেই চির-আনন্দ নিকেতনে আনন্দ ভবন পাতিবেন বলিয়া উৎফুল্ল হইয়াছেন; নদী যেমন সাগরের পানে উধাও হইয়া সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ছুটে; শিবানীও তদ্রূপ ছুটিয়াছেন। সহযাত্রীগণও চলিয়াছেন, চুনীলাল ভ্রাতৃজায়ার আগ্রহ, ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রাবল্য দেখিয়া আগ্রহ সহকারে পাছু পাছু চলিয়াছেন।

সুশীল আসিবার সময় টাকা-কড়ি রীতিমত আনিতে বলিয়াছিলেন, চুনী আবশ্যক মত পাথেয়, আহারাদির খরচের মত সম্বল আনিয়াছেন। বেশী অর্থাদি লইয়া পথ চলা ত ভাল নহে—ইহাতে অনর্থই ত বেশী হইবার সম্ভাবনা?

সূর্য্যদেব গগনে উদিত হইয়া যখন প্রচণ্ড কিরণ বিতরণ করেন, যাত্রীদল তখন কোন চটীতে আশ্রয় লইয়া আহারাদি এবং বিশ্রাম করিতে থাকেন, রৌদ্র একটু মন্দীভূত হইলেই আবার সকলে একত্রে পথ অতিবাহিত করেন। উৎসাহের সীমা নাই—যে শিবানী বাড়ীর বাহির হইতে লজ্জাবোধ করিতেন, সামান্য গোলমাল শুনিলে যাঁহার প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত, সেই শিবানীর পথ অতিবাহন, দেখিলে বাস্তবিক স্তম্ভিত হইতে হয়। আজ একপক্ষ হইল পথের এই মহাকষ্ট সহ্য করিতেছেন, তথাপি দৃকপাত নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভুবনেশ্বরে

রথের আর বেশী দিন নাই। পুরীর রাজবাত্মে লোক ধরে না—চারিদিক হইতেই লোক রথে বামনদেবকে দর্শন করিবার জন্য ছুটিয়াছে।

শিবপুর হইতে যে সকল যাত্রী রথ দেখিতে বাহির হইয়াছিল, তাহাদের সকলেই চলিয়া গিয়াছে। পথে পড়িয়া আছেন, কেবল শিবানী ও চুণীলাল, তাঁহারা এখনও পৌছিতে পারেন নাই। তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া চলিতেছেন, তথাপি পথ শেষ হয় না। হৃদয়ে বিশ্বাস-ভক্তির সম্মীলন হইয়াছে; প্রাণের প্রাণ পতিদেবতাকে বহুদিনের পর দর্শন করিতে পাইবেন বলিয়া, শিবানী এত কষ্টেও পথের কষ্ট বোধ করিতে পারেন নাই; দ্বিগুণ উৎসাহে পথ চলিতে লাগিলেন। শিবানী জীবনে কখন এরূপ কষ্ট স্বীকার করেন নাই, এ কষ্টের অবধি নাই; তথাপি প্রাণ-পুলকপূর্ণ, বদনে একটুমাত্র মালিন্যের চিহ্নমাত্র নাই।

পরশু প্রাতঃকালে রথের টান হইবে। যাত্রীগণ এখন আহারাদির প্রতিদৃষ্টি না করিয়া কেবল চলিতেছে। কত আসিল, কত যাইল, শিবানীও যাইতেছেন, তিনিও দ্রুতগতি চলিতেছেন—কিন্তু কই, পথ ত ফুরায় না?

শিবানীর বড় কষ্ট হইতে লাগিল, দেখিয়া **চুণীলাল** বলিলেন, বৌ-দি! যতটুকু পারিবে—ততটুকু চল, ক্ষমতার অতিরিক্ত পথ হাঁটিলে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে, তখন একুল, ওকুল, দুকুল যাইবে—পথেই পড়িয়া থাকিতে হইবে, কেন ভগবান ত পালান নাই, যে তাঁহার জন্য এত তাড়াতাড়ি যাইতে হইবে, কেন, এ রথ না হয়, উল্টো রথ ত দেখা হইবে?

শিবানী বলিলেন—আর কতদূর আছে? তুমি মনে করিতেছ, যে আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাহা হয় নাই; আমি বেশ যাইতেছি।

চুণী বলিলেন—এইরূপ চলিলে, আমরা পরশুদিন পৌঁছিতে পারি, কিন্তু রথ টানা কেমন করিয়া হইবে—এবার অতি প্রত্যুষেই রথের টান হইবে, তত সকালে কি আমরা পৌঁছিতে পারিব?

শিবানী। ঠাকুর-পো! ভক্তের ভগবান, তিনি অন্তর্যামী, আমি যখন রথের প্রথম টান দেখিবার জন্য প্রাণে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছি, তখন তাঁহাকে এ আশা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিতে হইবে, তার জন্য চিন্তা নাই।

চুণী। বৌ-দি! প্রথম টান না দেখিলে কি, কোন ফল হয় না?

শিবানী। ভাই! ফললাভের আশা করিয়া, রথ দেখিতে আসি নাই। তিনি ত প্রথম হইতেই সুফল প্রদানের লোভ দেখাইয়া আমাদের বাড়ী হইতে টানিয়া আনিতেছেন, প্রথমেই তথায় জনতা খুব বেশী হয়—যাবতীয় লোকজন প্রথমেই সেই প্রাণারামের পরম

বিগ্রহ দেখিতে আসেন, সাধু-সন্ন্যাসী সকলেও এই সময় উপস্থিত হন। গুরুদেবও তোমার দাদা, অন্যদিন বাহির হউন, আর নাই হউন, এ দিন এ সময় নিশ্চয়ই বাহির হইয়া, প্রভুর দর্শনে আসিবেন—তাহা হইলে আমাদের সহিত দেখা হইবার খুব সম্ভাবনা।

চুণী। বৌ-দি সেই ভয়ানক জনতার মধ্যে তোমাকে লইয়া কেমন করিয়া তাঁহাদের অনুসন্ধান করিব?

শিবাণী। আমি একস্থানে বসিয়া থাকিব; কোন পাণ্ডার আশ্রয়ে আমাকে রাখিয়া তুমি তাঁহাদের অন্বেষণ করিবে।

চুণী। তাহা ভিন্ন আর উপায় কি? এখন চল, এই পথটুকু যাইয়া, একটা চটীতে একটু বিশ্রাম করিগে, একটু জলপান না করিলে, আর চলিতে পারা যায় না।

শিবাণী। নিকটে কি কোন পান্থশালা তোমার জানা আছে?

চুণী। হাঁ আছে! এই বলিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা একটা পান্থনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সমস্ত দিনের পর কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন। সেদিন আর কোন যাত্রীই নিশা-যাপনের ইচ্ছা করিল না, সকলেই আহারাদির পর চটীত্যাগ করিল। চটীয়াল চুণীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—ঠাকুর মশাই! অপর সকলে ঠিক-সময়ে পৌছিলেও পৌছিতে পারে, কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া বোধ হয়, যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারিবে না।

চুণী তাহার কথায় আস্থা স্থাপন না করিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, দেখা যাক্, জগবন্ধু কি করেন। "জয় জগন্নাথ, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর" বলিয়া তাহারাও দুইজনে অগ্রসর হইলেন। শক্তিস্বরূপিনী শিবানী এবার এমন পথ চলিতে লাগিলেন, যে চুণীলালের ন্যায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিও তাঁহার সহিত চলিতে অশক্ত হইয়াছিল; চরণ আর চলিতে পারে না, প্রতিপদে পদস্খলন হইতেছে, তথাপি বিরাম নাই।

প্রাণে যাহার দৃঢ়তা আসিয়াছে, হৃদয়ের অনুরাগ যাহার পথ প্রদর্শক, তাহার অসাধ্য কি আছে? শিবানী দেবরসহ সেই রাত্রেই তাঁহারা মহাকাল ভৈরব ভুবনেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই মঙ্গলময় সতীপতি স্বয়ম্ভু মহাদেব দর্শনে সতী ভাবে বিভোর হইয়া, চরণপ্রান্তে প্রণত হইলেন, মনে-মনে বলিলেন—সতীনাথ! আমার মনের ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়; উপস্থিত হইবামাত্রই যেন আমার হৃদয়-দেবতার সন্ধান পাই; আমার রথ দেখার উদ্দেশ্য কেবল নাথের দর্শন; প্রভু! তোমার নিকট আমার মনের ভাব ত কিছু অবিদিত নাই, ঠাকুর! প্রভুর পদে প্রার্থনা শেষ করিয়া ভক্তি গদ-গদ প্রাণে দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত সতী আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইলেই রথের টান হইবে—তাই সকল রাজপথ আজ সজাগ; চিরদিন যে সকল পথ কদাচিৎ দুই একজন পান্থের পদ বক্ষে ধারণ করিয়া নিভৃতে নির্জ্জনে অতি কষ্টে পড়িয়া থাকিত,

আজ তাহাদের সেই বক্ষঃ দারুণ পদভরে বিদারিত হইয়া যাইতেছে। চিরদিনের সুখ একদিনের দারুণ যন্ত্রণায় যেন। বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া পড়িতেছে। রাজবর্ত্ম টলমল; অসংখ্য যাত্রীর পদভরে উৎপীড়িত,—ধ্বস্ত, বিধ্বস্ত,—লোকের কলরবে কাণপাতা যায় না। জনস্রোত অনবরতই চলিয়াছে, বিরাম নাই—সময় অতি অল্প, প্রাতেই রথের টান, কাজেই সকলে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া দৌড়িতেছে, আর এক-একবার দারুণ কষ্টের লাঘব জন্য সেই জন-সমুদ্র হইতে ভীষণ কলনাদে কল্লোল উঠিতেছে, "জয় দারু-ব্রহ্ম প্রভু জগন্নাথ তুমিই সত্য।"

একটানা স্রোতের মত কত আসিতেছে, জনস্রোত কুলপ্লাবিত করিতেছে, তত বড় রাস্তায় স্থান কুলায় না, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাহা কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে।

শিবানীর পায়ের তেজ পুরুষের মত না হইলেও, তাহাদের মত উঠিপড়ি করিয়া চলিতে না পারিলেও মনের তেজ বড় বেশী। প্রাণ যার এমন ভক্তিপ্রেমে ভরা, হৃদয় যার এমন প্রবল বিশ্বাসে পরিপূর্ণ; ভগবানের নিকট তাহার সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল সাধ যে মিটিবেই মিটিবে—তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রথম টানেই প্রভুর রথরজ্জু আকর্ষণ করিব, সেইখানেই আমার হৃদয়-দেবতার সন্ধান পাইব। সতী এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া, একান্ত মনে চলিয়াছেন।"

নবম পরিচ্ছেদ

রথে বামন

আজ প্রাতেই রথের টান। কিছুক্ষণ পরে বারবেলা পড়িবে, কাজেই প্রধান পাণ্ডা অতি প্রত্যূষে আসিয়া দেবতাগণের বেশভূষা সমাধান করিয়া রথে তুলিলেন। স্বর্গের যাবতীয় সুষমা যেন একত্র হইয়া রথের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। সৎচিৎ-আনন্দরূপে ত্রিমূর্ত্তি আজ রথে বিরাজিত, প্রধান পাণ্ডা **বামদেব পণ্ডিত** রথের উপরিভাগে প্রভুর সম্মুখে করযোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডায়মান। আর একজন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দণ্ডায়মান, যাঁহার অতুলনীয় সাধনতেজ দীপ্তদিনমণীর ন্যায় প্রভা-প্রোজ্জ্বল। বহুসংখ্যক লোক রথরজ্জু ধরিয়া টানিতে উদ্যত, কিন্তু রথ নড়ে না—রথ চলে না; কত চেষ্টা, কত কৌশল করা হইল—তথাপি নবনির্ম্মিত কাঠের রথ অচল, অটল। প্রধান পাণ্ডা প্রমাদ গণিলেন, কাঁদিয়া-কাঁদিয়া ধ্যানস্থ হইলেন—দেবতার আদেশ হইল,—"আমার সকল প্রকার ভক্ত এই রথে সমাগত হইয়াছে; কিন্তু যে পতিকে জগৎ-পতি ভাবিয়া পতিপূজা করে—যে আদর্শ পতিব্রতা—সে এখনও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই—তাঁহার পবিত্রকরস্পর্শ না হইলে, রথ চলিবে না।" **বামদেব** বিস্মিত হইলেন, প্রভুর আদেশ পাইয়া চারিদিকে লোক ছুটাইলেন, নিজে মন্দির প্রবেশের রাস্তায় করযোড়ে দাঁড়াইয়া

রহিলেন—কখন সেই প্রভাময়ী মাতৃমূর্ত্তি পুরী প্রবেশে সকলকে ধন্য করেন।

এমন সময় এক অপূর্ব্ব দীপ্তিময়ী বৃদ্ধা রমণী প্রৌঢ়যৌবন বিশিষ্ট একটী লোকের সহিত পুরোদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কি এক অব্যক্ত সুষমা যে তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত ছিল—তাহা বর্ণনা করা যায় না। বামদেব দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, যুক্তকরে বলিলেন,—এস,—এস মা! রথরজ্জু স্পর্শ কর। রমণী নম্রতার হাসি হাসিয়া রথরজ্জু স্পর্শ করিবামাত্র সেই নির্জ্জীব রথ যেন সজীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ঘোর ঘর-ঘরঘোষে, ভীষণশব্দ করিয়া চলিতে লাগিল—আর লক্ষ-লক্ষকণ্ঠে প্রতিধ্বনী হইল, "জয় জগন্নাথ জীকি জয়, জয় সতী-সিমন্তিনী পতিব্রতা মাইকী জয়।" বলিয়া সকলে প্রাণের জোরে রথরশ্মি আকর্ষণ করিতে লাগিল। প্রধান পাণ্ডা সেই পবিত্র প্রাণী দুইটীকে রথে তুলিয়া লইলেন। রথ গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল।

এইবার কাতারে কাতারে জনস্রোত সেই অপরূপ প্রভা আভ্রময়ী রমণীর নিকট আসিয়া, তাহাদিগকে ঘেরিয়া ধরিল—রমণী সলজ্জভাবে একপার্শ্বে অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার সঙ্গে যিনি ছিলেন, তিনি অবাক হইয়া গিয়াছেন—সতীর অসীম তেজোপ্রভা দেখিয়া, আর কথা কহিতে পারিতেছেন না।

এমন সময় সেই রথারূঢ় দ্বিতীয় ভাস্কর-প্রভা-সম্বন্বিত সন্ন্যাসী মূর্ত্তি ভাব বিগলিত-স্বরে, বাহু প্রসারিয়া "কই মা, আয় মা, আমার সত্যকিঙ্করের আদরিণী, আয় তোর দর্শনে, তোর পবিত্র

স্পর্শে আমিও পবিত্র হই," বলিয়া জনসংঙ্ঘ ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীমূর্ত্তি নিকটবর্ত্তী হইবামাত্রই পতিব্রতা ও তাঁহার সঙ্গী সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহার পদতলে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

সন্ন্যাসী শশব্যস্তে সতীকে উত্তোলন করিয়া, বিনয়-নম্রবচনে বলিলেন, মা! আমি তোর কুলগুরু বলিয়া, তোর প্রণাম গ্রহণ করিতে পারি, নতুবা তুই আমারও প্রণম্য। সতী সন্ন্যাসীর পদস্পর্শ করিয়া বলিলেন,—ঠাকুর করেন কি? শিরোমণী কখন কি শির ছাড়িতে পারে! তুমি আমার নাথের নাথ, তুমি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, সাধক চূড়ামণী,—তুমি স্বয়ং জগন্নাথ দেব। এক্ষণে তোমার প্রিয়পুত্রের সন্ধান বলিয়া দিয়া, তোমার এই আশ্রিতা কন্যার প্রাণদান কর। তাঁকে না দেখিয়া আর আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। এখন তিনি কোথায়; কুশলে আছেন ত?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—মা! যার পত্নীর পবিত্রকর স্পর্শে প্রভু জগন্নাথ দেবের অচল রথ সচল হয়—লক্ষ-লক্ষকণ্ঠে যার জয়ধ্বনী উত্থিত হইয়া, গগন-পবন পবিত্র করে—তার প্রাণ-প্রিয়পতি কি কখন অকুশলে থাকিতে পারে? মা! সত্যকিঙ্কর পান্নালাল খুব কুশলে আছে; তবে সে এখন সাধারণ মানুষ হইতে খুব উচ্চে, দেবত্বলাভের উপযুক্ত হইয়াছে। অনেক সময়ে সমাধীস্থই থাকে; খুব-কম-সময় বাহ্যচৈতন্য প্রাপ্ত হয়—আহারাদি নাই, ঘুম তাঁহার কাছে আসিলে ঘুমাইয়া পড়ে; তোমাদের আগমন পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে আনিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ

করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার উপস্থিত অবস্থা এবং এই অতিরিক্ত জনতা দেখিয়া, আসিতে সাহস করি নাই। শিবানী আনন্দের অশ্রু ফেলিয়া দেবতার দর্শনে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শিবানী ত শ্রীক্ষেত্রের দেবতা দেখিবার জন্য আসেন নাই—তিনি যে তাঁহার অভীষ্ট-মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণ জুড়াইতে আসিয়াছেন—এ সকল মরা দেবতায় তাঁহার প্রাণের পরিতৃপ্তি হইবে না।

অবধূত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ—দেবাসনে সমাসীন, এতদিন তিনি রতন ঠাকুরের বংশোদ্ধারের জন্য ধরায় অবতীর্ণ ছিলেন, আর বেশীদিন থাকিবেন না। ভবলীলা তাঁহার শেষ হইয়াছে; এইবার রতন ঠাকুরের পুত্র ও পুত্র-বধূ সাধক-সাধিকা, পান্নালাল ও শিবানীকে "মায়ার খেলা" হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারিলেই, তাঁহার জগতের সকল কর্ত্তব্য শেষ হয়, তিনি অনন্তে মিশিয়া যান।

আজ অতি শুভদিন; কলিতে দীক্ষা-গ্রহণ সকলেরই পারত্রিক নিস্তারের উপায়, তবে শিবানীর আর মন্ত্রগ্রহণের আবশ্যক হইবে না, চুণীর চিত্ত স্থির হয় নাই—ইহা তাঁহার খুব দরকার, তথাপি ছলনা করিয়া শিবানীকে বলিলেন, মা! মন্ত্রগ্রহণের কাল ও স্থান, আজ খুব ভাল—তোমরা মন্ত্রগ্রহণ কর।

শিবানী করযোড়ে বলিলেন, দেব! চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণের জন্য, প্রাণের ঐকান্তিকতা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রগ্রহণ; এক দেবতায় স্থিতধীঃ হইয়া সাধনা করিবার জন্য দীক্ষার প্রয়োজন; আমার প্রাণ ত প্রাণের দেবতা ছাড়া আর কিছু চায় না, আর কিছু

ভাবে না, আর কিছু দেখিতে সাধ করে না, যা দেখে, যা করে, যা ভাবে, তাহা স্বামী-দেবতা ছাড়া আর কিছু নয়—আপনি অন্তর্য্যামী, সমস্ত জানেন—ইহার উপর অন্য-মন্ত্র দিবার আবশ্যক থাকিলে প্রদান করিতে পারেন। অবধূত সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া শিবাণীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং সাধারণ প্রথানুসারে তাঁহার কর্ণে তাঁহার চির-আরাধ্য স্বামী-মন্ত্র, অভীষ্ট দেবের মন্ত্র রূপে প্রদান করিলেন। সতী আনন্দে আত্মহারা হইয়া, তাঁহার পূজনীয় স্বামীকে জগৎময় অবলোকন, জগৎ-স্বামীর ভাবে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার দর্শন জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তার পর সবিনয়ে বলিলেন—প্রভু! চুণী আমার বড় দুঃখী—সে আজীবন ত্রিতাপে তাপিত; বড়কষ্টে আছে, সে আমার বড় আদরের—আমার বংশের দুলাল—তাঁহার কষ্ট নষ্ট করিয়া দাও, সে আপনার পথ আপনি চিনিয়া লউক। সতীর কথা শেষ হইতে না হইতে অবধূত আগ্রহে চুণীকে বাহুবেষ্টন করিয়া, ভগবান নারায়ণ, সুভদ্রা, বলরামের সম্মুখে তাঁহাদের কুলমন্ত্র,—ছিন্নমস্তার. বীজমন্ত্র চৈতন্য করিয়া তাহার কর্ণে প্রদান করিলেন। চুণীর হৃদয়-ক্ষেত্র সরস উর্ব্বর ছিল—সে, সেই মহা বীজ ধারণ করিয়া ধন্য হইল।

দর্শকমণ্ডলী সে দৃশ্য দেখিয়া সকলেই মোহিত হইয়া গেল। সকলেই মহাপুরুষ অবধূতের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া, মুক্তকণ্ঠে বলিল,—আজ আমাদের যথার্থ রথে দেবদর্শন হইল—আমরা ধন্য হইলাম। উপরে ত্রিমূর্ত্তি, নীচেও ত্রিমূর্ত্তি, মরি মরি, এমন না হইলে

কি মানুষ বলিয়া গণ্য হওয়া যায়! আজ এই সৎ-চিৎ-আনন্দময় নিত্যনিরঞ্জন ভগবানের ত্রিমূর্ত্তির সম্মুখে এই দেবতুল্য মূর্ত্তি তিনটীকে দেখিয়া আমাদের জীবন সার্থক হইল।

বলদেব পাণ্ডা এতদিন রথের শোভাযাত্রা করিতেছে, কিন্তু এবারের মত অপার্থিব আনন্দভোগ, এমন সাধু-সম্মিলন— তাঁহার ভাগ্যে আর কখন হয় নাই, সে অতীব ভক্তিভরে প্রণত হইয়া বলিল, "প্রভু! আপনাদের তিনটীকে এবং যাঁহার নাম শুনিতেছি তাঁহাকে, প্রভুর পসাদ খাওয়াইয়া ধন্য হইতে চাই!" সাধু-সজ্জন কখন কাহার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন না, **অবধূত** স্বীকৃত হইয়া তাঁহাদের বাসস্থানের সন্ধান বলিয়া দিয়া, প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

মিলনে মুক্তি

রথের পূর্ব্বে **অবধূত** ও **সত্যকিঙ্কর** পুরীতে উপস্থিত হইলে জ্ঞানরাজ্যে ভারতের একচ্ছত্রী **পরমহংস শঙ্করাচার্য্য** মঠের একজন পাণ্ডা, **অবধূতের** একজন গুরুভ্রাতা তাঁহাদের সাদরে গ্রহণ করতঃ স্বর্গদ্বারেই মঠের অধিকারভুক্ত একটী নিভৃত, নির্জ্জন কুটীর তাঁহাদের অবস্থানের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। যে সকল যাত্রীর অর্থ নাই, অবস্থানের স্থানাভাবে যাহারা বিপন্ন হয়, তাহারা বিনা অর্থে এখানে থাকিতে পায়। **পাণ্ডা মহাশয়**

তাঁহাদের বাসস্থান জানিয়া তথায় **মহাপ্রসাদ** প্রেরণ করিয়া দিলেন। আনন্দময়ের আনন্দভোগ আজ বহুদিন পরে প্রাণ ভরিয়া উদরস্থ করিয়া, ভক্ত সকলে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্তি করিলেন।

জগতে মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। তাহা হইতে ব্রাহ্মণকুলে শক্তিসাধক হইয়া জন্মগ্রহণ সুদুর্লভ, বহুজন্মের পুঞ্জীকৃত তপঃ সম্বল না থাকিলে এ সৌভাগ্যভোগ হয় না। এখানে করিবার, দেখিবার, কহিবার কিছু নাই, এ ধামে যাহারা আসে, তাহারা নিষ্কাম, কামনা-বাসনার বৃশ্চিক দংশন—তাঁহাদের জ্বালাতন করিতে পারে না, সাংসারাশক্তি পরিতৃপ্তি না করিয়া, এ পুরে প্রবেশ করিলে ব্রহ্ম দর্শন হয় না। কেবল কাদা ঘাটাই সার হয়, মাছ ধরিয়া, সে, জীবনের সফলতা লাভ করিতে পারে না। এ তীর্থে আসিলে মানুষ আত্মহারা হইয়া আপন ভুলিয়া যায়—সংসারের টান, সংসারের ভাব তাহার একেবারে অভাব হইয়া পড়ে; তাই শুনা যায়—**আত্মভোলা**। জননী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রকেও এখানে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিয়া, সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিত—জীবনের সকল আশা ত্যাগ করিত।

আজ এখানে যে কয়টী সাধক একত্র সমুপস্থিত হইয়াছেন—ইহাদের সকলেরই সংসার-ভাব তিরোহিত, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত, সকলে ব্রহ্মভাবে বিভোর হইয়া জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই ব্রহ্ম-সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়াছেন। **পরমানন্দ ও সত্যকিঙ্কর পান্নালালের** ত কথাই নাই। **পান্নালাল** ত সংসারের সমস্ত সুখৈশ্চর্য্য অবহেলায় ত্যাগ করিয়া, প্রব্রর্জ্যা অবলম্বন করিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ পরমপুরুষ শ্রীগুরুদেব **অবধূতের** সহ যাবতীয় তীর্থে ব্রহ্মজ্যোতি

দর্শন করিয়া, আজ ব্রহ্মভাবের পূর্ণ-প্রভার-বিশিষ্ট, তীর্থ-প্রধান পুরীধামে আসিয়াছেন; এখানে সাধকের বাহ্যভাব বেশী কিছু থাকে না—তাই পান্নালাল এখানে আসিয়া অবধি ক্ষণে-ক্ষণে সমাধীস্থ হইতেছেন। পুরীধামের দেবসম্পদ সকল দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও পান্নালালের তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না। শিবানীর প্রাণে অন্য কোন দেবতা দর্শনের সাধ নাই, তিনি বলিলেন, "স্বামীই পরম দেবতা, স্বামীই ব্রহ্ম এই ভাবিয়া সমাধীস্থ দেবতার চরণতলে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন।" চুণীলালের হৃদয়-ক্ষেত্র সরস-উর্ব্বর হইয়াছে বটে, কিন্তু বীজবপন এতদিন হয় নাই, সেদিন শুভক্ষণে অবধূত তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। তথাপি দাদার ও বৌ-দিদির এই দেবভাব দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় যেন ভক্তিভাবে গলিয়া গিয়াছে—কতদিনে এই ভাব প্রাপ্ত হইবেন, তাহার জন্য গুরুপদে আত্ম-নিবেদন করিতেছেন। চুণীলাল নির্ব্বেদ-বিকার-শূন্য হইয়াছেন, হৃদয় প্রেমভক্তির আধার হইয়াছে, জানিতে পারিয়া গুরুদেব একদিন তাহাকে পুনরায় শাক্তাভিষেক করিয়া ধন্য করিলেন। এ জগত্ ছাড়িয়া যাইবার সময় হইয়াছে, আর বেশী দিন বাকী নাই—তবে আর কেন তাহাকে ভবারণ্যে ভবঘুরের মত রাখিয়া যাই—সে, যে বস্তু, পান্নালালও ত সেই বস্তু, আমার প্রাণের প্রাণ রতনের প্রাণের ধন। আর চুণী মন্ত্রগ্রহণের পর বেশ উপযুক্ত হইয়াছে; এখন আর তাহাতে কোন পশুভাব নাই, জীবনের শেষভাগে মন্ত্র-জপে সে মানুষ হইতে পারিবে বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার ন্যায় গুরুর নিকট মন্ত্র-গ্রহণের সৌভাগ্য যাহার

হইয়াছে—তাঁহার পশুত্ব মোচনের আর ভাবনা কি? চুণী হাতে যেন স্বর্গলাভ করিয়াছেন, হৃদয়ের বিষাদভাব অপসারিত হইয়াছে।

একদিন সকলের পুরী ভ্রমণের ইচ্ছা বলবতী হইল। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে পুরীর অনতিদূরে মহাকাল ভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া আসিলেন। তার পর পুরীতে অন্তরে যাহা দেখিতে ছিলেন, পুরুষোত্তমে আসিয়া তন্নতন্ন করিয়া তৎ সমস্ত একবার বাহ্য দর্শনে দেখিয়া লইলেন। হিন্দু-ধর্ম্মের নিয়মানুসারে সস্ত্রীক পূজা—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে রত্নবেদিকায়, হৃৎপদ্মে সৎচিৎআনন্দময় বিগ্রহ দেখিয়া, পান্নালাল সংজ্ঞাশূন্য হইলেন—সমাধীস্থ হইয়া যেন সে ত্রিমূর্ত্তি হৃদয়পদ্মে বিশেষভাবে আবদ্ধ করিলেন—শাক্তভক্ত পান্নালালের, ইষ্টমুক্তি দেবী-ছিন্নমস্তা আজ ত্রিমূর্ত্তি ধরিয়া এই রত্নমন্দিরে কি শোভাই বিস্তার করিয়াছেন—এ যে তাঁর মায়ের মূর্ত্তি—মা যে তাঁর বিশ্বময়—তাঁর মা ছাড়া অন্য মূর্ত্তি যে নাই; নয়নে যা দেখেন তাই যে মা, যা শুনেন তাই যে মায়ের করুণা আহ্বান, যা করেন তাহা তাঁরই যে কর্ম্ম—যেখানে যান সে যে তারই ধাম—বিশ্বব্যোমভরা বিরাটমূর্ত্তি যে তাঁহার মায়ের, তিনি অনন্ত অসীম, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, নিরাকার; যাহার আকারে সমস্ত আকার পরিস্ফুট—তিনি নাই কোথা?

পতিপ্রেমানুরাগিনী, পত্যেকগতি, শিবানী দেখিতেছেন—আমার এই পতি দেবতাই ত জগতের পুরুষ শ্রেষ্ঠ, আর সকলে যে আমার ভবানীপতি, দুর্গাপতি, উমাপতি, সকলেই আমার বালগোপাল—পুত্ররূপে বিরাজিত; পুরুষ আর

কেহ নাই। ভাবরাজ্যে যাহারা যথার্থ ইষ্ট আরাধনা, প্রাণের সাধনা করেন—তাহাদের ভবি এইভাবেই পর্য্যবসিত হয়, এইভাবেই তাঁহারা নরাকারে দেবতার স্থান অধিকার করেন।

বহুক্ষণ হইল সকলে সমাধীস্থ হইয়াছেন। কেবল বলদেব পাণ্ডা, যিনি সাধক-সম্প্রদায়কে দেখিয়া তাঁহাদের নিকট সকল ভুলিয়া তাঁহাদের দেবভাব দেখিতেছিলেন—দেবতা ও এই পুরুষ-গণের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে না পাইয়া ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার চৈতন্য তিরোহিত হয় নাই। চুনী-লালও কিছুক্ষণ মন্ত্র-জপে তন্ময় হইয়াছিলেন, তার পর বাহ্য চৈতন্যলাভ করিয়া, বিহ্বলপ্রাণে দাদা, বৌ-দিদি ও গুরুদেবের তপঃপ্রভাব দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমে সকলেরই সমাধি ভঙ্গ হইল—কিন্তু পান্নালালের আর সমাধি ভাঙ্গে না; সমস্ত বাহ্যইন্দ্রিয় আছে—অথচ ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য নাই, হাত-পা নড়ে না, চক্ষু দর্শন করে না, নাসিকায় আর শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে না। অবধূত সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, পান্নালাল যেরূপ ভাবে ভাব সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার এইভাবে জগৎকার্য্য শেষ হইবে, আজ বুঝি তাহাই হইল। অব-ধূত আজ আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিয়া চুনীকে বলিলেন, বৎস। চল তোমার দাদাকে এখান হইতে লইয়া যাই, বলিয়া সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে কুটীরে আনিলেন, মৃত্যুর কোন লক্ষণ নাই, হাত-পা শক্ত হয় নাই, কুটীরে আসিয়া অবধূত তাঁহার কণ্ঠদেশে জয়মালা প্রদান করিয়া চুনীকে ও শিবানীকে বলিলেন,—

মা! আর পান্নালালের চৈতন্য হইবে না, সে চৈতন্যময়ীর চরণে আপন চৈতন্য লয় করিয়াছে, চুণী দাদা তোমার ভাবের ঘোরে ভবের ঘোর কাটাইয়াছেন, এ মৃত্যু দেবতারও প্রার্থনীয়! চুণীর হৃদয় তত মজবুত হয় নাই, সে কাঁদিয়া ফেলিল।

শিবানী গুরুর কথায় স্বামীর অবস্থা ভাবিয়া—হায়! প্রাণের দেবতা আমার স্বর্গে, তবে আমি আর হেথায় কেন! বলিয়া হা নাথ চিরদাসীকে ওপদে! স্থান দাও, বলিয়া যেমন তাঁহার পাদপদ্মে আছাড় খাইয়া পড়িলেন, অমনি হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রহিত হইল, শিবানীও প্রাণের দেবতার সহগামিনী হইলেন। যাহারা যথার্থ পুরুষোত্তমে আসে, তাহারা আর গৃহে ফেরে না, ইহারাও আর ফিরিলেন না, পুরুষোত্তমে আসা ইহাদের সার্থক হইল। চুণী প্রথমে সংসারের দুটী প্রধান সহায় হইতে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। তার পর অবধূতের মুখে জগতের নশ্বরত্ব ও তাহার দাদা ও বৌ-দির মৃত্যুতে ক্রন্দননিষিদ্ধ বলিয়া বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন,—দুঃখ হইলে কাঁদিতে হয়, শোকেই কান্না আসে কিন্তু ইহা ত শোকের মৃত্যু নয়, ইহা যে নরজীবনে দেবত্ব লাভ, শোক করিয়া পাপ করিও না, আনন্দই ইহাতে কর্ত্তব্য, দাদা ও বৌ-দির উদ্ধার হইল বলিয়া আনন্দ কর। বলদেব পাণ্ডা শুনি-লেন, আচম্বিতে এই সংবাদে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন, তার পর স্বর্গদ্বারে সমুদ্র-তটে চিতাসজ্জিত হইল, বলদেব চন্দন কাষ্ঠের চিতা প্রস্তুত করাইলেন। তার উপর সতী শিরোমণি শিবানী ও তদুপরি পান্নালালের পবিত্র পার্থিব দেহ

স্থাপিত হইয়া চুণীর দ্বারা অগ্নি সংযুক্ত হইল। চারিদিক সদ্গন্ধে পরিপূর্ণ হইল, চিতার ধূমরাশি উত্থিত হইয়া স্বর্গে দেবতার পদে মিশিতে লাগিল। মহাপ্রয়াণে অনুপ্রাণিত হইয়া সিন্ধু উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতে লাগিল, যখন সব শেষ হইল, তখন অবধূত সেই গভীরনীলিমাময় ভীষণ-তরঙ্গে গা-ভাসান দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "চুণী! আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে বাপ! আমিও চলিলাম, কিছুদিন তোমার দাদার পুত্র-কন্যাগণের শোকাপনোদন করিয়া তুমিও এইরূপে ভবাব্ধি পার হইবে—চিন্তা করিও না। প্রশান্ত-নীল-নীলাম্বু অবধুতের পবিত্র দেহ তরঙ্গে-তরঙ্গে নাচাইয়া শেষে অনন্ত কালের কোলে তুলিয়া দিল। লোক চক্ষু আর তাহা দেখিতে পাইল না। চুণীলালের এ সময়কার অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তিনি নিস্পন্দভাবে শোক-বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে একবার নির্ব্বাণোন্মুখ চিতার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, আর একবার উদাস-প্রাণে সমুদ্রের প্রতি তাকাইয়া অনন্তের ভাব দেখিয়া বলিতেছেন——

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথাভূত বিশেষ সংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান॥
অনেক বাহূদর বক্ত্র নেত্রং পশ্যামী ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥

সমুদ্র চিন্তার সহিত সেই বিরাট-পুরুষের বিরাট-মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া বিশ্বভাব হৃদয়ে পোষণ করতঃ বলদেব পণ্ডিতের নিকট বিদায় লইয়া চুণী সেইদিনই স্বদেশাভিমুখে রওনা হইলেন।

উপসংহার

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইল, কিন্তু পাঠক! বলিতে পারেন কি? শিবানীর এ সৌভাগ্য কেমন করিয়া উপজাত হইল? তিনি ত জীবনে কখন বার-ব্রত বা ধর্ম্ম-কর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন না, এ সকল আচরণ করিতে বলিলে, তিনি রুষ্ট ব্যতীত তুষ্ট হইতেন না! তবে এইরূপ দেবারাধ্য সৌভাগ্যলাভ তাহার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইল? হিন্দু-শাস্ত্র বলেন—

> নাস্তি স্ত্রীনাং পৃথক যজ্ঞঃ না ব্রতং নাপ্যুপোষণং।
> পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
> পত্যৌ জীবতি যা নারী উপোষ্য ব্রতমাচরেৎ।
> আয়ুঃ সংহরতে পত্যৌ সা নারী নরকং ব্রজেৎ।

ব্রাহ্মণেতর জাতির দ্বিজপূজা ও স্ত্রীজাতির পতিপূজার তুল্য ঐহিক ও পারত্রিক নিস্তারের সহজ উপায় আর নাই। কৃচ্ছ সাধ্য সাধনা করিয়া যাহা না হয়—ইহারা কায়মনে উক্ত শাস্ত্র-বাক্য পালন করিলে, বিনায়াসে জীবনের পথ মুক্ত করিতে পারেন, ঋষি-বাক্য কখন অন্যথা হইবার নহে। পুরাণাদিতে ইহার বহু প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য নহে।

চুণীলাল শিবপুরে আসিয়া তাঁহাদের একমাত্র সুহৃদ পরাণ দোকানীকে প্রথমে এই মর্ম্মবিদারক সংবাদ দিলেন—

ক সম্বরণ করিতে পারিল না, সে কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে
র পর শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া চুনীলাল যখন
প্রভার বাটীতে প্রবেশ করিলেন—তখন জমীদার
তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। পিতামাতার সহিত শেষ দেখা
া পুত্র-কন্যার পক্ষে কিরূপ হৃদয়-বিদারক, আত্মীয়-
া মর্ম্মঘাতক তাহা সহজেই বিবেচ্য! বরাহনগরে
ণ ও ভানুমতী এ শোক সংবাদে কাঁদিয়া
ন। প্রিয়ভৃত্য নিতাই এ সময় জীবিত থাকিলে এ
দ যে সে কি করিত—বলিতে পারা যায় না।
ল চক্ষের জলে ভাসিয়া সকলকে সান্ত্বনা করিলেন।
মার বড়ই কাতর হইয়াছিলেন। তিনি আজীবন কেবল
ালাইয়াছিলেন—একদিনের জন্য সুখী করিতে পারেন
হঠাৎ তাঁহাদের চিরবিদায়ে তাঁহার শোকের অবধি
চুনীলাল নানা উপায়ে তাহাকেও সান্ত্বনা করিলেন,
শুর শাশুড়ীর পারলৌকিক আদ্যশ্রাদ্ধে বিস্তর টাকা
সুনাম অর্জ্জন করিল।
াল ইহার পর দুইবৎসর থাকিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রগুলিকে
দিয়া তাহাদের বিবাহকার্য্য সমাধানান্তে সংসারী করিয়া
ও সুশীলের আর একটী কন্যা হইল দেখিয়া,
লকে সৎ-উপদেশ দিয়া একদিন এমনভাবে গৃহত্যাগ
কেহ জানিতে পারিল না; কত অনুসন্ধানেও তাঁহার
সংবাদ পাওয়া গেল নাই।

মায়ার খেলা

শিবপুরের উপকণ্ঠে যেখানে ডিউক
সাকুকিউলার রোড একত্র মিশিয়াছে,
এখনও ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য সত্যকিঙ্কর পাঁজা
অতুলনীয় কীর্ত্তি "চাটুয্যের হাট" বর্ত্তমান
প্রত্যহ তথায় পাইকারী হাট বসে, ক্রয়বিক্রয় হয়,
আর নাই—যেন প্রাণহীনভাবে বহুকষ্টে লোকে
করতেছে, এখন সে স্থানের নূতন নাম হইয়াছে "
সব গিয়াছে, কেবল স্মৃতিটুকু লইয়া চাটুয্যের
নাম ঘোষণা করিবার জন্য এখনও সেখানকার প্রকৃ
শস্য-শামলা ধান্য-ক্ষেত্র হইতে শোকভরা দীর্ঘ-নি
সংগ্রহ করিয়া, হা-হা হু-হু রবে চারিদিকে বিকীর্ণ
সহিত আপন হৃদয়ের সম-বেদনা জ্ঞাপন করিতে